সম্পাদকীয়

তাহরীকে জাদীদ-এর সাফল্যে অংশীদার হতে পেরে আমরা আনন্দিত

মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ করুণায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এ পর্যন্ত এত কিছু অর্জন করেছে যার বর্ণনা এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে সম্ভব নয়। ইসলামের বিশ্বজনীন পূর্ণ বিজয়ের লক্ষে এ জামা'তের অন্যতম একটি আন্দোলন হলো তাহরীকে জাদীদ। এর প্রবর্তন করেছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)। তিনি ঐশী ইঙ্গিতে এর ভিত রচনা করেছিলেন আর স্বয়ং খোদা তাআলা এই আন্দোলনকে এতটা বিস্তৃতি দান করেছেন যে ক্রমেই তা উন্নতির পর উন্নতির সোপান অতিক্রম করে চলছে। এ মহান আন্দোলনের সাথে একাত্ম হতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি।

তাহরীকে জাদীদের অবদান স্বরূপ আমরা দেখতে পাই, বর্তমানে প্রায় ২০০ টি দেশে প্রকৃত ইসলাম তথা আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে। ৬৯ টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ অনুবাদ ছাপা হয়েছে, যার মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে লাখো লাখো পথহারা মানুষ এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করছে এবং সঠিক পথের সন্ধান পাচ্ছে। এই আন্দোলনে সংগৃহীত আর্থিক কুরবানী সারা বিশ্বে সেবার ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করছে। নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলনকে আল্লাহ্ তাআলা এমন বিরল গুণ-সম্পন্ন জনশক্তি দান করেছেন যারা সততা ও বিশ্বস্ততা দিয়ে অগণিত লোকদের সেবা করে যাচ্ছে। মানবতার কল্যাণে যখনই যে সেবার কোন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে নির্ভীক এই সেবকগণ সদা নি:স্বার্থ থেকে ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে সকলের মঙ্গলার্থে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

আমরা দেখতে পাই, তাহরীকে জাদীদের সুফল হিসেবে তৌহীদের ধ্বনি উচ্চকিত করতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রায় প্রতিদিন একটি করে মসজিদ লাভ করছে। এই আন্দোলনের সফলতার মধ্যে অনেক বড় একটি অর্জন হলো–এম.টি.এ। এটি আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টেলিভিশন, যার মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা সারা বিশ্বে খাঁটি ইসলাম প্রচার করা হয়। সারা বিশ্বে এই চ্যানেল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন সামাজিক শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি প্রচার করে থাকে। তাহরীকে জাদীদ বিশ্বকে, এম.টি.এ-এর মত অসাধারণ এক প্রচার মাধ্যম দান করেছে বিশ্বব্যাপী প্রচার মাধ্যমে এম.টি.এ-এর মত এক অসাধারণ নেয়ামত দান করেছেন। এটা সারা বিশ্বে প্রকৃত ইসলামের একক আহ্বান। আর এসব সম্ভব হয়েছে তাহরীকে জাদীদের কল্যাণের ফলে।

ত্রিত্ববাদের দাজ্জালী ফেতনা মানুষের লোভ-লালসাকে উস্কিয়ে দিয়ে যখন আত্মঘাতি নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গোটা বিশ্বকে প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক নানাবিধ বিপদাবলীর মাঝে ঠেলে দিয়েছে তখন তাহরীকে জাদীদের মুতালেবা তথা দফাসমূহের অনুশীলন ও বাস্তবায়ন নেহায়েত জরুরী হয়ে পড়েছে। যেমন–সাধা-সিধা জীবন-যাপন, পোশাকের বাহুল্য ব্যয় সঙ্কোচন, অর্থ-সম্পদের লালসা ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে নির্মোহ জীবন-যাপন আর তদুদ্দেশ্যে মানব কল্যাণার্থে সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ সর্বোপরি খোদা-বিমুখ মানুষকে খোদামুখী করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ।

যুগ-খলীফার আশিস লাভ করে এই আন্দোলন এখন এতটা বিস্তৃতি লাভ করেছে যে ত্রিত্ববাদের আবাসভূমি তথা আজকের বিশ্বে উন্নত বিশ্ব বলে পরিচিত রাষ্ট্র–ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশগুলোতে মানুষ যখন জাগতিক সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে অভিবাসী হচ্ছে– তাহরীকে জাদীদ তখন সেই সব দেশে আধ্যাত্মিক বিপ্লব ঘটানোর জন্য তৌহীদের বার্তা–***'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্'***-এর প্রেমময় বাণী পৌঁছিয়ে বিভক্তির সীমারেখা মুছে দিচ্ছে, প্রতিষ্ঠিত করছে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত গৃহ মসজিদ।

এ বিশাল কর্মকাণ্ডে যারা এখনও অংশ নেননি, তাদেরকে অনতিবিলম্বে এতে অংশ নেয়ার আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি, হতে পারে তা অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে, সেবা দান করে, সর্বোপরি মহান আল্লাহ্ তাআলার সমীপে সকাতর দোয়া যাচনা করে।

১৫ নভেম্বর ২০০৯

সূচীপত্র — *পৃষ্ঠা নং*

- **কুরআন শরীফ** — ২
- **হাদীস শরীফ** — ৩
- **অমৃত বাণী** — ৪
- *জুমুআর খুতবা ঃ* — ৫-১৩
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- **নেযামে নও (নব বিশ্ব-ব্যবস্থা)** — ১৪-১৭
  ভাষান্তর ঃ মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্
- **সংস্কারকের আবশ্যকতা** — ১৮-২০
  সরফরাজ এম.এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী
- **ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলাম প্রচার প্রসার ও বিস্তারে আহমদীয়াত** — **২১-২৩**
- **পাকিস্তানে আরেকজন আহমদী মুসলমানের শাহাদত** — ২৪
- **হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এর বাংলাদেশ সফর** — ২৫-২৬
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
- **ইব্রাহীমি কুরবানী চির প্রবহমান হোক** — ২৭-২৯
  মাহমুদ আহমদ সুমন
- **মসজিদ আল্লাহর ঘর** — ৩০-৩১
  মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ
- **চলুন আমরা ভাল হই** — ৩২
  মৌ. এনামুল হক রনী
- **সংবাদ** — ৩৩
- **কৃষিপাতা** — ৩৪-৩৫
- **দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে** — ৩৬
  সংকলন ও উপস্থাপনা ঃ এম. আহমদ

প্রচ্ছদ ডিজাইন : তারেক আহমদ সবুজ

কুরআন শরীফ
সূরা হাজ্জ-২২
কুরবানীর নির্দেশ

৩৫। আর আমরা প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানীর একটা নিয়ম পদ্ধতি[১৯৫২] নির্ধারণ করে দিয়েছি যেন তারা সেসব গবাদি পশুর ওপর আল্লাহ্‌র নাম নেয় যেগুলো তিনি তাদের দান করেছেন। অতএব তোমাদের উপাস্য একজনই[১৯৫৩]। সুতরাং তোমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর। আর তুমি সুসংবাদ দাও বিনয় অবলম্বনকারীদের।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ
إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٥﴾

৩৭। আর যেসব কুরবানীর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের অন্তর্গত করে দিয়েছি তোমাদের জন্য সেগুলোতে কল্যাণ রয়েছে। অতএব সারিতে দাঁড় করিয়ে সেগুলোর ওপর আল্লাহ্‌র নাম নাও। আর (জবাই করার পর) সেগুলো যখন (মাটিতে) ঢলে পড়ে তখন তা থেকে খাও, স্বল্পেতুষ্ট (অভাবী)-দেরও খাওয়াও এবং সাহায্য প্রার্থীদেরও (খাওয়াও)[১৯৫৪]।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ
فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا
وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَ
الْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

১৯৫২। *'নাসাকালিল্লাহে'* অর্থ সে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করেছিল এবং স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে অবিরাম সৎকর্ম করেছিল। *'মানসাকা'* শব্দের অর্থ ত্যাগের নিয়ম-প্রণালী; যে স্থানে এরূপ অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয় (আকরাব)। এই আয়াত দ্বারা কুরবানীর বিষয়-বস্তু সূচীত হয়েছে। (তিনটি মূল বিষয় বস্তুর একটি যার সম্বন্ধে এই সূরা আলোচনা করেছে) অপর দুইটি হল হজ্জ এবং জিহাদ। আয়াতটি আরও প্রতিপন্ন করে এ কুরবানী সম্বন্ধে আদেশ কেবল ইসলামের মধ্যেই সর্বজনীন, কারণ এটা এক অভিন্ন ঐশী সূত্র থেকে উদ্ভূত। আয়াতে আরও প্রমাণিত হয় যে, এটা পশুরই কুরবানী ছিল যা আদিকাল থেকেই সকল ধর্মের অনুসারীদের ওপর নির্দেশ করা হয়েছিল এবং নরবলির নিষ্ঠুর প্রথা পরবর্তী কালের প্রবর্তন।

এতদ্‌দৃষ্টে অকৃত্রিম এ কুরবানী তিন প্রকার অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ঃ

(ক) এটা স্বেচ্ছাকৃত এবং স্বতঃস্ফুর্ত হওয়া উচিত; (খ) এই কুরবানী পবিত্রতম উদ্দেশ্যে হতে হবে, (গ) এটা পার্থিব বিবেচনা-প্রসূত কুরবানী হলে চলবে না।

১৯৫৩। আয়াতটি দুই প্রকার অর্থ বহন করে: (১) কুরবানীর নিয়ম প্রণালী সর্ব ধর্মে সর্বজনীন, যদিও এরা একে অপর থেকে আপন আপন উৎপত্তির স্থান ও কালের দিক থেকে বহু দূর, ব্যবধানে পৃথক পৃথক। এই বাস্তব ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, আদিতে তারা সকলেই একই সর্বোচ্চ উৎস থেকে উদ্ভূত এবং সকল জাতির খোদা-ই এক ও অভিন্ন খোদা।

(অবশিষ্টাংশ ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হাদীস শরীফ
কুরবানী

❑ হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, হে লোক সকল (জেনে রাখ)! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা আবশ্যক (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

❑ হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানীর আয়োজন করেনি, সে যেন আমাদের ইদগাহের নিকট না আসে (ইবনে মাজাহ্)।

❑ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, নবী করীম *সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম* ঈদগাহেই যবাই করতেন (বুখারী)।

❑ হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক আসে আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোন কিছু স্পর্শ না করে (না কাটে)। অপর বর্ণনায় আছে, সে যেন কোন কেশ না ছাঁটে এবং কোন নখ না কাঁটে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখবে সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখসমূহের কিছু না কাঁটে (মুসলিম)।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানীর আয়োজন করেনি, সে যেন আমাদের ইদগাহের নিকট না আসে (ইবনে মাজাহ্)।

❑ হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ *সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম* নিষেধ করেছেন, আমরা যেন শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু কুরবানী না করি (ইবনে মাজাহ্)।

❑ হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ *সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম* শিংওয়ালা খুব বলবান দুম্বা কুরবানী করতেন যার চোখ কালো, মুখ কালো এবং পা কালো (আরবের এরূপ দুম্বাকে খুব সুন্দর বলে মনে করা হয়) [তিরমিযী, আবু দাউদ নিসায়ী ও ইবনে মাজাহ্]।

❑ বনী সুলাইম গোত্রীয় সাহাবী হযরত মুজাশে' থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ *সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম* বলতেন, ছয় মাস পূর্ণ ভেড়া এক বছরের ছাগলের স্থান পূর্ণ করে (আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্)।

❑ তাবেয়ী নাফে (রা.) হতে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, কুরবানীর দিনের (অর্থাৎ দশই যিলহজ্জের) পরেও দুই দিন। ইমাম মালেক এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হযরত আলী (রা.) থেকেও এমন একটি উক্তি রয়েছে।

❑ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ *সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম* মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেছেন আর বরাবর কুরবানী করেছেন (তিরমিযী)।

❑ হযরত যায়েদ বিন আকরাম (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ *সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের* সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই কুরবানী কী? হুযূর (সা.) উত্তর করলেন, তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম *আলাইহিস সালামের* সুন্নত (নিয়ম) তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কি (সওয়াব) আছে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হুযূর (সা.) বললেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে, তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পশমওয়ালা পশুদের পরিবর্তে কি হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী)। হুযূর (সা.) বললেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে (আহমদ ও ইবনে মাজাহ্)।

অমৃতবাণী
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)
কুরবানীর তাৎপর্য

এসব কুরবানী, এর শাস নয় খোসা। আত্মা নয় দেহ। এ সুযোগ-সুবিধা ও আরাম আয়েশের যুগে হাসি-খুশীর ঈদ পালিত হয়ে থাকে। আর ঈদের পরিণতি বলতে লোকেরা হাসি-খুশী নানা ধরনের খাবার দাবারের আয়োজন করাকে ধরে নিয়ে থাকে। মহিলারা এ দিনে সকল প্রকার অলংকার পরিধান করে। ভাল থেকে ভাল কাপড়ে সুসজ্জিত হয়। পুরুষেরা ভাল ভাল পোষাক পরিধান করে থাকে, আর উত্তম খাদ্য একত্রে পরিবেশন করা হয় এবং এটাকে এমন আনন্দ ও খুশীর দিন মনে করে যে, কৃপণ থেকে কৃপণতর লোক আজ মাংস খেয়ে থাকে। বিশেষ করে কাশ্মীরীদের পেট তো ছাগল বকরীর দ্বারা বোঝাই হয়ে যায়। অন্যান্য লোকেরাও আসলে পিছনে পড়ে থাকে না। মোট কথা, প্রত্যেক ধরনের খেলা-ধূলা হাসি তামাশার নাম ঈদ মনে করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, প্রকৃত তত্ত্বের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি প্রদান করা হয় না।

গভীর রহস্য

প্রকৃতপক্ষে এ দিনের গভীর রহস্য এটা ছিলো যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) কুরবানীর যে বীজ বপন করেছিলেন এবং একান্তে নীরবে বপন করেছিলেন, আঁ হযরত *সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম* সেই কুরবানীর বায়ু হিল্লোলিত সবুজ শ্যামল ক্ষেত দেখিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পুত্রকে খোদা তাআলার আদেশে যবাই করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। গুপ্তভাবে এতে এই ইঙ্গিত ছিলো যে, মানুষ যেন দেহ মনে খোদার হয়ে যায়। আর খোদার আদেশের সম্মুখে সে তার প্রাণ, নিজের সন্তান সন্ততি ও তার নিকটাত্মীয়-স্বজনের রক্তও তুচ্ছ জ্ঞান করে। রাসূল করীম *সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের* যুগে তিনি এমনই এক পরিপূর্ণ পথ নির্দেশনার দৃষ্টান্ত ছিলেন যে-কতই না বেশি কুরবানী দেয়া হয়েছে, রক্তে জঙ্গল প্লাবিত হয়ে গেছে যেন রক্তের নদী প্রবাহিত হয়েছে। পিতাগণ নিজ পুত্রদের, পুত্রগণ নিজেদের পিতাদেরকে হত্যা করেছেন। এতে তাঁরা আনন্দ পেতেন যে, ইসলাম ও খোদার পথে টুকরো টুকরো হয়ে কিমা করা হলেও, তাঁদের আনন্দ হতো। কিন্তু আজ চিন্তা করে দেখো যে, হাসি-খুশী ও খেলা-তামাশা ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিকতার কোন অংশ অবশিষ্ট আছে কি? এ ঈদুল আযহা পূর্বের ঈদ (ঈদ-উল-ফিতর) থেকে শ্রেয়: এবং সাধারণ লোকও এটাকে বড় ঈদ বলে থাকে। কিন্তু চিন্তা করে বলো যে, ঈদের কারণে কতজন লোক আছে যারা নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও নির্মল চিত্ততার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে থাকে এবং আধ্যাত্মিকতা থেকে অংশ লাভ করে? রমযানের ঈদ আসলে একটি সাধনার ফলশ্রুতি এবং ব্যক্তিগত সাধনা। আর এর নাম ***বাজলুর রূহ*** অর্থাৎ আত্মাকে বিক্রি করা কিন্তু এ ঈদ,যাকে বড় ঈদ বলা হয়, এর মধ্যে মহান সাফল্য নিহিত আছে এবং দু:খের সাথে বলতে হয় যে, এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়নি। খোদা তাআলা যাঁর দয়া গুণ কয়েকভাবে বিকশিত হয়ে থাকে। তিনি (আল্লাহ্) উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ওপরে খুবই উন্নত মানের এক করুণা দেখিয়েছেন। পূর্ববর্তী উম্মতের বিষয়াবলী ভাসাভাসা ছিল বা প্রাথমিক পর্যায়ের, এর মাহাত্ম্য করুণা লাভকারী উম্মতের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, সূরা কাওসারের মধ্যে খোদা তাআলার এই যে ৪টি গুণ বর্ণিত হয়েছে যেমন, **রাব্বুল আলামীন** (সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক), **আর রাহমান** (অযাচিত অসীম দাতা), **আর রাহীম** (পরম দয়াময়), **মালিকি ইয়াওমিদ্দীন** (বিচার দিবসের মালিক) যদিও সাধারণভাবে এসব গুণ এ বিশ্বের ওপরে জ্যোতির্বিকাশ ঘটায় কিন্তু ওগুলোর মধ্যে আসলে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। কিন্তু লোকেরা এর ওপর কমই দৃষ্টি দেয়।

(মালফুযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১-৩৩, ১৯৮৪ সনে মুদ্রিত)

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ * الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ * صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ (آمين)।

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا
مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ
نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٢﴾

এ আয়াতের অর্থ হল, 'যদি আমরা এই কুরআনকে কোন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি অবশ্যই একে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত হয়ে বিদীর্ণ হতে দেখতে। এবং আমরা মানুষের জন্য উপমারূপে যা বর্ণনা করি– যেন তারা চিন্তা করে।' (সূরা আল্ হাশ্‌র:২২)

কতক মানুষের হৃদয় এতটাই কঠোর হয়ে যায় যে, ঐশী বাণীর কোন প্রভাবই তাদের হৃদয়ে দাগ কাটে না; যদিও, যে আয়াত আমি তিলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, এই কুরআনকে আমরা পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করলে তা ভয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

অতএব আল্লাহ্ তাআলার এ কথা থেকে প্রমাণ হয় যে, কতক মানুষের হৃদয় পাহাড়ের চেয়েও বেশি কঠোর হয়ে থাকে। জন্মের উদ্দেশ্যকে তারা ভুলে যায়, আপন সৃষ্টিকর্তা এবং নিজেদের পরিণামকে ভুলে যায়।

সুরা বাকারায় আল্লাহ্ তাআলা মানব হৃদয়ের কঠোরতা সম্পর্কে বলেছেন,

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ
أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ
الْأَنْهٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۚ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'এরপর তোমাদের হৃদয় কঠোর হয়ে গেল, যেন তা পাথর সদৃশ বা এর চেয়েও অধিক কঠোর। এমনও পাথর আছে যা থেকে নদী প্রবাহিত হয়ে থাকে, আবার কতক এমনও রয়েছে যেগুলো বিদীর্ণ হলে তা হতে পানি বইতে থাকে, ঝর্ণাধারা উৎসারিত হয় আর এগুলোর মধ্যে এমনও কতক আছে যেগুলো আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে বিনত হয়ে পড়ে।(সূরা আল্ বাকারা:৭৫)

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার সিদ্ধান্ত, আল্লাহ্ তাআলার বাণী এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলার যে সব নিয়ম-নীতি চালু রয়েছে, জড়বস্তুর উপরও এর প্রভাব পড়ে। কিন্তু মানুষের হৃদয় এতটাই কঠোর হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন রীতি দেখার পরও তারা নিজেদের মাঝে কোন পরিবর্তন আনতে চায় না। সূরা বাকারার এ আয়াতে ইহুদীদের বরাতে আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু এই উদ্ধৃতিটি নিছক একটি ঘটনাই নয় বরং ভবিষ্যদ্বাণীও বটে; যদি আল্লাহ্ তাআলার ভয় (তোমাদের হৃদয়ে) সৃষ্টি না করো তাহলে তোমাদের হৃদয়ও এরূপ কঠিন হয়ে যাবে।

বর্তমান অবস্থা দেখুন! এটি মুসলমানদের জন্যও একটি চিন্তনীয় বিষয়। গভীরভাবে ভেবে দেখুন! এসব কেন হচ্ছে? পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমানরা নিজেদের অনুষ্ঠানাদিতে এখানকার রাজনীতিবিদদের নিমন্ত্রণ জানায় অথবা যখন তারা নিজেরাই কোন অনুষ্ঠান করে, তখন এসব লোক তাদের বক্তৃতায় মুসলমানদের প্রশংসা করে থাকে। কিন্তু

আজকাল পাকিস্তানেও হৈ-চৈ হচ্ছে। সেখানে সর্বত্র মারামারি-হানাহানির রাজত্ব। কোথাও বিদ্যুতের জন্য, কোথাও যুলুম-নির্যাতনের প্রতিবাদে, আবার কোথাও দ্রব্য-মূল্যের উর্ধ্ব গতির কারণে মিছিল হচ্ছে। কোথাও আবার অন্যান্য বিপদাপদ রয়েছে। নেতাদের (এ নিয়ে) কোন মাথা ব্যাথা নেই। সংবাদপত্রে কলামের পর কলাম লিখা হচ্ছে যে, আমরা ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছি। এসব হচ্ছেটা কি?

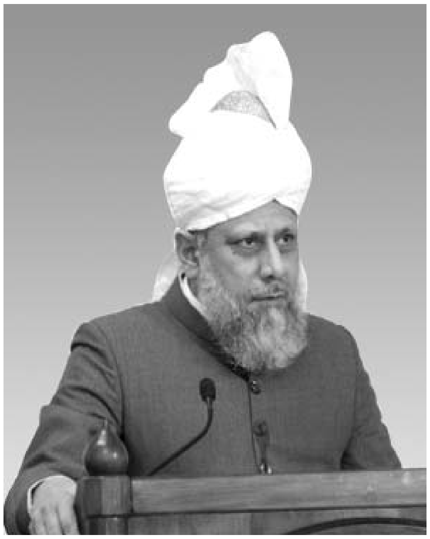

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯-এর (১১ তাবুক, ১৩৮৮ হিজরী শামসি) জুমু'আর খুতবা।

সামগ্রিকভাবে কোন সিদ্ধান্তের প্রশ্ন যখন উঠে, তখন নিজেদের পছন্দমত সিদ্ধান্তই তারা গ্রহণ করে, মুসলমানদের স্বার্থকে সামনে রাখা হয় না।

অতএব, (এসব দেশে) মুসলমানদেরকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দেয়া হয়, আর নিজেদের (মুসলমানদের) রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাদেরকে অন্যের দয়ামায়ার উপর নির্ভর করতে হয়, তদুপরি পার্থিব ও আসমানী বিপদাবলীতো আছেই। এসবের কারণ কী? সূরা হাশ্‌রের যে আয়াতটি আমি তিলাওয়াত করেছি এর পূর্ববর্তী আয়াতেও মু'মিনদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে, আর তাক্‌ওয়া অবলম্বনের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আগামী দিনের জন্য কিছু অগ্রে প্রেরণের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে। আখিরাত ও পরিণামের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে। (আল্লাহ্) বলছেন, অন্যথায় তোমরা নিজেদের পরিচয় (গৌরব) হারিয়ে ফেলবে। পাপাচারিতায় লিপ্ত হয়ে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হবে। কাজেই চেতনাবোধ জাগ্রত করো এবং শয়তানের খপ্পর থেকে মুক্ত হও; আর নিজেদের হৃদয়ের কঠোরতাকে আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণের মাধ্যমে কোমলতায় পরিবর্তন করো। কিন্তু শয়তান (তাদেরকে) এভাবে করায়ত্ত করেছে যে, তারা বাস্তবতা বুঝতে চায় না। এ অবস্থার চিত্র আল্লাহ্ তাআলা একস্থানে এভাবে অঙ্কন করেছেন,

وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ **'বরং তাদের হৃদয় আরো কঠোর হয়ে গেছে এবং তারা যা কিছু করে শয়তান তাদেরকে তা আরো সুশোভন করে দেখিয়েছে।' (সূরা আল্ আন্'আম:৪৪)** সব ধরনের বিপদাপদ এবং ক্লেষ হতে শিক্ষা নেয়ার পরিবর্তে অন্যায় অবিচারে আরো বেড়ে যায়, পাপাচারিতার ক্ষেত্রে আরো ধৃষ্ট হয়।

আজকাল পাকিস্তানেও হৈ-চৈ হচ্ছে। সেখানে সর্বত্র মারামারি-হানাহানির রাজত্ব। কোথাও বিদ্যুতের জন্য, কোথাও যুলুম-নির্যাতনের প্রতিবাদে, আবার কোথাও বাজারের উর্ধ্ব গতির কারণে মিছিল হচ্ছে। কোথাও আবার অন্যান্য বিপদাপদ রয়েছে। নেতাদের (এ নিয়ে) কোন মাথা ব্যাথা নেই। সংবাদপত্রে কলামের পর কলাম লিখা হচ্ছে যে, আমরা ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছি। কেন এসব হচ্ছে? এসবের একটি বড় কারণ আমি বলছি এবং অনেক আগে থেকেই বলে আসছি। আর তা হল, যুগ ইমামকে মানা তো দূরের কথা বরং এমন আইন প্রবর্তন করা হয়েছে যে, (যুগ ইমামের) মান্যকারীদেরকে আইনের যাঁতাকলে পিষ্ট করা হয়। আগে এসব অত্যাচার বন্ধ করো। প্রতিটি সরকারি কাগজ-পত্রে যুগ ইমামের বিরুদ্ধে গাল মন্দের যে বন্যা বইয়ে দেয়া হয়, সেগুলো বন্ধ করো; নতুবা (জেনে রেখো) খোদা তাআলার বিধান তাঁর প্রিয়পাত্রদের জন্য স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করে থাকে। পাকিস্তানে কোন অমুসলমান আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম নিলে বা গলায় লকেট পরলে তারা (অর্থাৎ পাকিস্তানীরা) অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কিন্তু আহমদীরা যদি আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম তাদের মসজিদ ও বাড়িতে লিখে, তবে সেগুলোকে ভেঙ্গে-চুরে নোংরা নর্দমায় ভাসিয়ে দেয়া হয়। তখন তাদের এ কথা মনে পড়ে না যে, এ সব সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নামের অসম্মান হচ্ছে; তখন রসুল (সা.)-এর অবমাননা তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। অতএব এ বিষয়গুলো যখন (তাদের) দৃষ্টিতে পড়ে না, তখন আল্লাহ্ তাআলার বিধানও স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করে।

পাকিস্তানের নামধারী মোল্লাদের অজ্ঞতার অবস্থা এমনই যে, মুবাশ্বের লুকমান সাহেব যিনি একজন টিভি প্রোগ্রামার ও উপস্থাপক, তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে একটি অনুষ্ঠান করছেন। টেলিভিশনে তার অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয়েছে। কত দিন নির্ভীকভাবে এ অনুষ্ঠান চালাতে পারবেন তা আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন। কিন্তু যাইহোক, একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে, তাতে একজন আলেম আহমদীদের বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, যেভাবে কোকা-কোলার একটি নিজস্ব ট্রেডমার্ক রয়েছে এবং অন্য কোন কোম্পানী এ নামে কোকা-কোলা প্রস্তুত করতে পারবে না, নতুবা ধরা পরবে– অনুরূপভাবে শুধু আমরাই মুসলমান আখ্যা পেতে পারি, আহমদীরা মুসলমান হবার দাবী করলে শাস্তি পাবে। এ সব উলামা এমন ফতওয়া দেয়– যাদের সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'এক যুগে মানুষ চরম অজ্ঞ লোকদেরকে তাদের নেতা নিযুক্ত করবে এবং তাদের কাছে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জানতে চাইবে; আর তারা (উলামারা) না জেনেই ফতওয়া দিবে।'** মোটকথা তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। মুসলমান কে? এ বিষয়ে আমি দীর্ঘ বিতর্কে জড়াতে চাই না। তবে এতটুকু জানা কর্তব্য, পরিপূর্ণ অনুগত, মহানবী (সা.)-এর সব আদেশ পালনকারী এবং পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ অনুসরণকারী যদি কেউ থেকে থাকে, মুসলমানের সংজ্ঞা যদি কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবে তারা আহমদী ভিন্ন কেউ নয়।

এখন আমি এ সম্পর্কে দু'টি হাদীস উপস্থাপন করছি যাতে মহানবী (সা.) মুসলমানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। আর এটি-ই হল (মুসলমানের) প্রকৃত সংজ্ঞা। এটি সে সব আলেমের দেয়া সংজ্ঞা নয়,

যারা কোকা-কোলার প্যাটেন্ট নামকে ইসলামের নামের সাথে তুলনা করতে চায়, এটি তাদের চরম অজ্ঞতা বৈ আর কিছু নয়।

হযরত আবি মালিক (রা.) হতে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, *'মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া কাফারা বিমা ইউ'বাদু মিন দুনিল্লাহি হারুমা মালুহু ওয়া দামুহু ওয়া হিসাবুহু আলাল্লাহি'* অর্থাৎ, **আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকার করে যে, আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া যাদের উপাসনা করা হয় তাদেরকে অস্বীকার করে, তখন তার প্রাণ ও সম্পদ সম্মানযোগ্য হয়ে যায়।** (তারা আইনগত নিরাপত্তা লাভ করে)। **তার হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলার হাতে ন্যস্ত। (মুসলিম-কিতাবুল ঈমান)** একমাত্র আল্লাহ্-ই তার নিয়্যত বা অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত এবং তিনি তাকে তার নিয়্যত অনুযায়ী প্রতিদান দিবেন। কলেমা পাঠ করার পর, ***'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'*** বলার পর, সে বান্দার হস্তক্ষেপের উর্ধ্বে চলে যায়।

অন্য আরেকটি হাদীসে হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, *'মান সাল্লা সালাতানা ওয়াস্‌তাক্ববালা ক্বিবলাতানা ওয়া আকালা যাবিহাতানা ফাযালিকাল্ মুসলিমুল্লাযী লাহু যিম্মাতুল্লাহি ওয়া যিম্মাতু রাসূলিল্লাহি ফালা তুখফিরুল্লাহি ফি যিম্মাতিহী।'* হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি আমাদের ক্বিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের যবাইকৃত পশুর মাংস খায়– সে মুসলমান। তার নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) নিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ্ তাআলার এই দায়িত্বের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল হবে না, একে অকার্যকর করার চেষ্টা করো না, এবং এর মাহাত্ম্যকে খাট করার চেষ্টা করো না।' (সহীহ্ বুখারী-কিতাবুস সালাত)**

অতএব, যে সব উলামা বিপরীত কথা বলে থাকে তাদের কাছে আমার নিবেদন, নিজেদের (মনগড়া) ইসলামকে প্যাটেন্ট করবেন না। এমন ইসলাম উপস্থাপন করবেন না, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর দেয়া সংজ্ঞা বিরোধী। মহানবী (সা.) প্রদত্ত সংজ্ঞাই ইসলামের সংজ্ঞা। এ সংজ্ঞা মোতাবেক মহানবী (সা.) আমাদেরকে মুসলমান আখ্যা দিয়েছেন, এরপর আমাদের আর কোন মৌলভী এবং কোন সংসদের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

এ প্রসঙ্গে আমি আরেকটি কথাও বলে দিতে চাই, সম্প্রতি কোন পত্রিকার বরাতে কেউ আমাকে একটি সংবাদ পাঠিয়েছে। সে এর ফটোকপি বা প্রিন্ট আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। আহমদীদের মাঝে আমাকে এমন খবর সম্পর্কে অবহিত করা অথবা খুব সম্ভব আমার মতামত জানার আগ্রহ থাকে। সংবাদটি হল, এম.কিউ.এম নেতা আলতাফ হোসেন সাহেব সম্পর্কিত, যিনি আহমদীদের পক্ষ নিয়ে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট বিবৃতি দিয়েছেন, আর পাকিস্তানে আহমদীদের সাথে যেসব যুলুম-নির্যাতন হচ্ছে, প্রকাশ্যে এর সমালোচনা করেছেন; এবং বলেছেন (আহমদীদের বিরুদ্ধে) অন্যায় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, অন্যায়াচরণ করা হচ্ছে। এ সংবাদ যখন প্রেসে পৌঁছে, যেহেতু সাংবাদিকরা কোন সংবাদকে সেনসেশনাল (আলোচিত) করার ব্যাপারে অতিউৎসাহী হয়ে থাকে; তাই সম্ভবত এতে এটি যুক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, লন্ডনে মির্যা মসরূর আহমদ ও আলতাফ হোসেনের মাঝে মিটিং হয়েছে। আর তারা পাঞ্জাব ও পাকিস্তানে এম.কিউ.এম-কে কীভাবে চাঙ্গা করা যায় তা নিয়ে পরিকল্পনা করেছে।

আলতাফ হোসেন সাহেবের বিবৃতির যতটুকু সম্পর্ক, আমার মতে প্রতিটি দেশপ্রেমিক পাকিস্তানী নাগরিক এটা চাইবে যে, দেশে শান্তি ফিরে আসুক, মোল্লাতন্ত্রের অবসান ঘটুক, ফির্কাবাজি এবং ধর্মীয় ঘৃণা-বিদ্বেষ দেশ থেকে দূরীভূত হোক। অত্যন্ত আনন্দের কথা, আলতাফ হোসেন সাহেব এমন বিবৃতি দিয়েছেন এবং সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন বলে আমি খুশি হয়েছি, বরং এবার বেশ ভাল বিবৃতি দিয়ে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, এথেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি দেশে শান্তি দেখতে চান– সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় হিংসা-বিদ্বেষ বিদূরিত করতে চান যাতে দেশের উন্নতি হয়। আমরা কারো নিয়্যতের ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারি না কেননা আল্লাহ্ তাআলাই নিয়্যত সম্পর্কে ভাল জানেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে সদুদ্দেশ্য অর্জনে সফল করুন এবং কখনও তিনি যেন রাজনীতি বা রাজনৈতিক বলির পাঠা না হন। কিন্তু গতকাল রাতেই যখন আমি খবর দেখার জন্য টেলিভিশন চালু করি তখন সংবাদে বলা হয়, খতমে নবুয়ত সংগঠনের উলামাদের উদ্দেশ্যে তিনি যে বক্তব্য প্রদান করেছেন এতে তারা আশ্বস্ত হয়েছে। খতমে নবুয়ত সংগঠনের আলেমদের রক্ষণশীল মনোভাব ছিল, আর তার এই বিবৃতির পর এখন তা দূর হয়ে গেছে। আমি বিস্তারিত দেখি নি, কি সংশয় ছিল আর কি-করেইবা তা দূর হলো; কিন্তু মনে হয় তিনি এমন কোন বিবৃতি দিয়েছেন যাতে মৌলভীরা আনন্দিত হয়েছে। মৌলভীদের দৌরাত্ম এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সম্প্রতি সংবাদপত্রে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি ছিল যে, আমি চাই অমুক-অমুক কাজ হয়ে যাক কিন্তু উলামাদের ভয় পাই। এই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার বহর।

আর আমার মিটিং এর যতটুকু প্রশ্ন, যেভাবে আমি বলেছি সাংবাদিকরা সংবাদ চটকদার করার উদ্দেশ্যে দিবা স্বপ্নও দেখে থাকে। যদি কোন মিটিং হতো তাহলে যেভাবে আলতাফ হোসেন সাহেব বিবৃতি দিচ্ছেন তাতে সম্ভবত এটিও তিনি বলে দিতেন যে, আমার সাথে মিটিং হয়েছে। তবে আমি একথা অবশ্যই বলবো, যে-ই দেশকে বাচাঁনোর এবং ঘৃণার এই দেয়াল সমূহ ভাঙ্গার চেষ্টা করবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে সফল করুন। আমরা দেশকে ভালবাসি, আমরা দেশ গড়ার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রেখেছি এবং প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যও সব ধরনের কুরবানী করে যাচ্ছি ও করে যাবো, ইনশাআল্লাহ। প্রত্যেক আহমদী এই দোয়া করা উচিত, যাতে আল্লাহ্ তাআলা দেশে ভাল নেতৃত্ব সৃষ্টি করেন।

আহমদীদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন এবং এটি প্রতিহত করার বিষয়টি আমরা আমাদের খোদার তাআলার নিকট সোপর্দ করেছি। আমরা যদি নিভৃতে কথা বলি, তবে তা শুধু প্রিয় প্রভুর সাথে। আর আমরা এ দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, আহমদীয়াতের পক্ষ্যে খোদা তাআলা যে পরিকল্পনা প্রনয়ণ করবেন এবং করছেন তার সামনে সকল মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা তুচ্ছ। পাকিস্তানে এবং সমগ্র ইসলামী বিশ্বে জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ্যে সেই ঐশী পরিকল্পনা অবশ্যই, অবশ্যই অত্যন্ত মহিমার সাথে পরিপূর্ণতা লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্ তাআলা। প্রকৃত মুসলমান কে এবং ইসলামের জন্য কারা সত্যিকার দরদ রাখে তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

অতএব আমি আহমদীদেরকে বলছি, বিশেষভাবে পাকিস্তানী আহমদীদেরকে– তারা দেশে বিদেশে যেখানেই থাকুন না কেন, আপনারা দেশের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তাআলা এ লোকদেরকে শুভ বুদ্ধি দিন এবং দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে তারা যে খেলায় মেতেছে তাথেকে যেন দেশ মুক্ত হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য মুসলমান দেশ ও আরব দেশসমূহে বসবাসকারী আহমদীদেরও রমযানের এই বিশেষ দিনগুলোতে যা দোয়া গৃহীত হবার ও আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের দিন, দোয়া করা উচিত আল্লাহ্ তাআলা সত্ত্বর যেন তাঁর ‘তক্দীরে মুবরাম’ (অটল বিধান) প্রকাশ করেন।

এবার আমি সেই আয়াতের বর্ণিত বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে আসছি যা আমি তেলাওয়াত করেছি। মুসলমানের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে কিছুটা সময় লেগে গেছে, তবে একথাগুলো বর্ণনা করাও আবশ্যক ছিল।

আল্লাহ তাআলা যা বলেছেন:

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ
خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

(সূরা আল্ হাশ্র:২২) এর তফসীর করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

‘প্রথমতঃ এর অর্থ হলো, কুরআন শরীফের প্রভাব এমনই, যদি এটি পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হতো তাহলে পাহাড় খোদার ভয়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যেত এবং মাটির সাথে মিশে যেতো। জড় বস্তুর উপর এর এমন প্রভাব থাকা সত্ত্বেও যেসব মানুষ এর প্রভাব থেকে লাভবান হয় না, তারা কতই না নির্বোধ। দ্বিতীয়তঃ এর অর্থ হল, দু'টি বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ঐশী ভালবাসা ও ঐশী সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না। প্রথমতঃ অহংকার পরিত্যাগ করা, যেভাবে উন্নত শিরে দাঁড়ানো পাহাড় ধ্বসে পড়ে মাটির সাথে মিশে যায়, তেমনিভাবে মানুষকে সকল প্রকার অহংকার ও নোংরা চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে বিনয় ও দীনতা অবলম্বন করা উচিত। এছাড়া তার পূর্বের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়া উচিত, যেভাবে পাহাড় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, ইট থেকে ইট পৃথক হয়ে যায়, তেমনিভাবে সে তার পূর্বের সম্পর্কসমূহ যা নোংরামী ও ঐশী অসন্তুষ্টির কারণ ছিল তা থেকে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ করা। এখন তার সাক্ষাত, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা যেন শুধুমাত্র আল্লাহ্রই জন্য হয়ে যায়।’ (আল্ হাকাম ৫ম খন্ড, ২১ নাম্বার, ১০ জুন, ১৯০১- পৃ:৯-তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), ৪র্থ খন্ড-৩৩৮ নাম্বার)

অতএব, এই অহংকারকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করা আর স্বীয় হৃদয় ভূমিকে সমতল করা প্রয়োজন। আমি পুনরায় ঐসব নামধারী আলেমদের বলবো, কথা ঘুরে ফিরে সেখানেই আসে, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মোকাবেলায় নিজেদের অহংকার পরিত্যাগ করতঃ মাথা নত না করবে, (ততক্ষণ) কুরআন ও ইসলামের এমন হাস্যকর সংজ্ঞা-ই দিতে থাকবে। (কেননা) বর্তমানে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে ভালবাসা রাখার দাবি করতে চাইলে, যুগ ইমামের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা আবশ্যক। এরপর দেখবে পূর্ব-পশ্চিম আর উত্তর-দক্ষিণে তোমাদেরকে কিরূপ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। তবেই তোমরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্ তাআলার এই পবিত্র বাণীর রহস্য ও ইশারা বুঝতে সক্ষম হবে, এর ব্যুৎপত্তি তোমরা লাভ করবে। কেননা, পবিত্র কুরআন বুঝার জন্যও খোদা তাআলার মনোনীতের প্রয়োজন হয়ে থাকে। যেভাবে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ
مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

অর্থাৎ **‘নিশ্চয়ই এটি মহা সম্মানিত কুরআন। যা এক গুপ্ত সুরক্ষিত কিতাবে আছে। পবিত্ররা ছাড়া কেউ একে স্পর্শ করতে পারবে না।’ (সূরা আল্ ওয়াকে'আ:৭৮-৮০)**

এ আয়াতগুলোতে যেখানে অমুসলমানদের সামনে পবিত্র কুরআনের সম্মান ও মাহাত্মের বহিঃপ্রকাশ করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে যে, এর এক গভীর মাহাত্ম্য আছে। এমন এক গ্রন্থ যা অমূল্য ধনভান্ডার, যার শিক্ষা সুরক্ষিত। অর্থাৎ অবতীর্ণ হবার সময় থেকে এটি সুরক্ষিত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র হৃদয় নিয়ে এ থেকে লাভবান হওয়া পছন্দ করবে সেই কল্যাণমন্ডিত হবে। একই সাথে মুসলমানদের জন্যও এতে উপদেশ রয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র হৃদয় নিয়ে এর উপর আমল না করবে আর পরিপূর্ণরূপে এর তাৎপর্য অনুধাবন না করবে এবং এই গুপ্ত রত্নভান্ডারকে অর্জন করার জন্য সেসব পবিত্রাত্মার অন্বেষণ না করবে, যাদেরকে খোদা তাআলা ব্যুৎপত্তি দান করেছেন বা করেন; ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র মুসলমান হলেই এ থেকে কল্যাণমন্ডিত হওয়া যাবে না। আর এ যুগে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগমনকারী মসীহ্ ও মাহদীর-ই এই মর্যাদা লাভ করার কথা ছিল এবং লাভ করেছেন। আর খোদা তাআলা কাছ থেকে সরাসরি জ্ঞান লাভ করে তিনি (আ.) এই মহান কিতাবের রহস্যাবলী উন্মোচন করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

'কুরআনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান ও তত্ত্বাবলী কেবল তার সামনেই উন্মোচিত হয়, যাকে পবিত্র করা হয়েছে।' (বারাকাতুদ্ দোয়া-রূহানী খাযায়েন-৬ষ্ঠ খন্ড-পৃ:১৮)

'অতএব এসব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন বুঝার জন্য এমন এক শিক্ষকের প্রয়োজন আছে যাকে খোদা তাআলা নিজ হাতে পবিত্র করেছেন। কুরআন শিক্ষার জন্য যদি শিক্ষকের কোন প্রয়োজন না হতো তাহলে প্রাথমিক যুগেও প্রয়োজন ছিল না।' তিনি (আ.) বলেন, **'এটি বলা যে, শুরুতে কুরআনের কঠিন বিষয়াবলী সমাধানের জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখন যেহেতু সমাধান হয়ে গেছে তাই শিক্ষকের আর প্রয়োজন কি? এর উত্তর হল, সমাধানকৃত বিষয়ও কিছুকাল পর পুনরায় সমাধানের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এছাড়া প্রত্যেক যুগে উম্মতকে নতুন নুতন সমস্যাবলীর সম্মুখীনও হতে হয়।'**

এখন দেখুন! উম্মতে তা কার্যতঃ দেখাও যাচ্ছে। এক সময়ে পবিত্র কুরআনের কয়েকশ' আয়াতকে রহিত বলে মনে করা হতো। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র বান্দা, যাঁকে তিনি জ্ঞান দিয়েছেন, তিনি সেগুলোর সমাধান করেন, আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), এসব সমস্যার সমাধান করেন। অতএব, শিক্ষকের আবশ্যকতা ইসলামের ইতিহাস থেকেও প্রমাণিত। এত যে ফির্কাবাজী তার কারণ হলো, প্রত্যেকে নিজ নিজ পছন্দ ও রুচি অনুসারে যা বুঝেছে তাকেই চূড়ান্ত কথা মনে করে এর উপর অনুশীলন করেছে আর তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বড় বড় সমস্যার কথা বাদ দিন; ওযু সম্বন্ধেও মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন মতবিরোধ দেখতে পাওয়া যায়, অথচ পবিত্র কুরআনে এ সম্বন্ধে পরিষ্কার দিক নির্দেশনা রয়েছে।

যাই হোক, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেন: **'কুরআন সকল জ্ঞানের সমষ্টি।'** অর্থাৎ সর্বপ্রকার জ্ঞান এতে পাওয়া যায়। **'কিন্তু একই যুগে এর সকল জ্ঞানভান্ডার প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক নয়, বরং যখন যে সমস্যাবলীর উদ্ভব হয় তদনুযায়ী কুরআনের (সে সম্পর্কিত) জ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং প্রত্যেক যুগের সমস্যা অনুযায়ী সেসব সমস্যার সমাধানকারী আধ্যাত্মিক শিক্ষক প্রেরণ করা হয়।'**

(শাহাদাতুল কুরআন-রূহানী খাযায়েন-৬ষ্ঠ খন্ড-পৃ:৩৪৮)

অতঃপর তিনি (আ.) খুতবা ইলহামীয়াতে বলেছেন, **'বলা হয়, মসীহ্ ও মাহদীর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই, বরং কুরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট- আর আমরা সঠিক পথে আছি। অথচ তারা জানে, কুরআন এমন একটি কিতাব, পবিত্র ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কারো বোধবুদ্ধি এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উদঘাটন করতে পারে না। এ কারণে এমন একজন মুফাস্সের (ব্যাখ্যাকারক)- এর প্রয়োজন পড়েছে, যাকে খোদা তাআলা স্বহস্তে পবিত্র করেছেন এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়েছেন।' (খুতবা ইলহামীয়া-রূহানী খাযায়েন-১৬তম খন্ড-পৃ:১৮৩-১৮৪, রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত। তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-৪র্থ খন্ড-পৃ:৩০৯)**

বর্তমানে মুসলমানদের এই দুরাবস্থার কারণ হচ্ছে, তারা তাঁকে {হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)}-কে মানতে অস্বীকার করছে যাকে খোদা তাআলা মনোনীত (প্রেরণ) করেছেন, যিনি খোদা তাআলা কর্তৃক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে এসেছেন এবং এ যুগে তিনি আমাদের সামনে কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। অতএব মুসলমানদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা এবং উম্মতের সম্মান ও মর্যাদা কেবল মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিককে মানার ও তাঁর কথার উপর আমল করার মাঝেই নিহিত।

তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন: **'সত্য কথা হচ্ছে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী যুদ্ধ-বিগ্রহের ধারা বন্ধ করবেন; আর কলম, দোয়া ও খোদার প্রতি মনোযোগের মাধ্যমে ইসলামের জয় ঢাক বাজাবেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, মানুষ এ বিষয়টি বুঝতে পারে না, কারণ পার্থিবতার প্রতি তাদের যতটা মোহ বা আকর্ষণ আছে, ধর্মের প্রতি ততটুকু নেই। পার্থিব অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত থেকে কীভাবে এই প্রত্যাশা করতে পারে যে, তাদের জন্য পবিত্র**

কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান উন্মোচিত হবে? সেখানে (কুরআনে) পরিষ্কার লেখা আছে, لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ **(মলফুযাত-৪র্থ খন্ড-পৃ:৫৫৩-রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত)**

এটি সাধারণ মুসলমানদের জন্য যেমন চিন্তার বিষয়, তেমনই আমরা যারা আহমদী মুসলমান তাদেরকেও নিজ নিজ দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। অতএব, এই বরকতপূর্ণ মাসে প্রত্যেক আহমদীকে খোদা তাআলার দরবারে এ দোয়াও করা উচিত, আমাদের হৃদয় সমূহকে এমনভাবে পবিত্র করো, যাতে পবিত্র কুরআনের আশিস সমূহ হতে আমরা সেভাবে কল্যাণ লাভ করতে পারি, যেভাবে খোদা তাআলা একজন সত্যিকার মু'মিনের কাছে প্রত্যাশা করেন; আর এ যুগে যার ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত মহাপুরুষ আমাদের সামনে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য, শিক্ষা ও এর মর্যাদা সম্বন্ধে কুরআন করীমের অনেক স্থানে যা বর্ণনা করেছেন, এর কতক দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি; সত্যিকার অর্থে গোটা কুরআনই এই বর্ণনায় পরিপূর্ণ–যারা পবিত্র কুরআনের অনুপম শিক্ষামালার উপর অনুশীলনকারী হবে তারা কি মর্যাদা লাভ করবে?

যে ব্যক্তি পবিত্র হৃদয়ে এটি বুঝে এবং বুঝার চেষ্টা করে তার মর্যাদাও অনেক বড়। এ সম্বন্ধে একটি বর্ণনায় এসেছে, সাহ্ল বিন মা'আয জোহনী তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে এবং তার উপর আমল করেছে, কিয়ামত দিবসে তার পিতা-মাতাকে এমন দু'টি মুকুট পরানো হবে যার দ্যুতি সূর্যের আলোর চাইতেও উজ্জল হবে, যা তাদের পার্থিব ঘর (কে আলোকিত) করতো।' (সুনান আবু দাউদ-কিতাবুস্ সালাত)**

তার পিতা-মাতা যদি এ মর্যাদার অধিকারী হয় তাহলে ভেবে দেখুন! যে কুরআনের প্রতি আমল করেছে সেই ব্যক্তির মর্যাদা কিরূপ হবে?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একথা বলেছেন, **'যারা কুরআনকে সম্মান করবে, তারা আকাশে সম্মান লাভ করবে।' (কিশতিয়ে নূহ্-রূহানী খাযায়েন-১৯তম খন্ড-পৃ:১৩)**

এই সম্মান তখনই লাভ হবে, যখন আমরা এর (শিক্ষার উপর) অনুশীলন করবো। এছাড়া এর উপর যে আমল করে তার মর্যাদা আল্লাহ্ তাআলার নিকট কতটুকু, তা উক্ত হাদীস থেকে সহজেই অনুমেয়।

পবিত্র কুরআন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ও এর অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: **'যেহেতু পবিত্র কুরআন খাতামুল কুতুব ও আকমালুল কুতুব** (সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ গ্রন্থ-অনুবাদক) **এবং আসমানী গ্রন্থ সমূহের মাঝে অতুলনীয় ও সুন্দরতম। তাই এর শিক্ষা সমূহের ভিত্তি রেখেছেন– উৎকর্ষের চরম মার্গে। আর এটি সকল অবস্থায় প্রাকৃতিক বিধানকে আইনের বিধানের সাথে সামঞ্জস্য করে দিয়েছে যাতে এটি লোকদেরকে পথভ্রষ্টতা হতে সুরক্ষিত রাখে। আর তিনি এই ইচ্ছা পোষণ করেছেন, সে-ই মানবকে যেন নিস্প্রাণ বস্তুর ন্যায় বানিয়ে দেয় যা স্বয়ং ডানে-বামে নড়া-চড়া করতে পারে না এবং মহাপরাক্রমশালী খোদা তাআলার অনুমতি ব্যতিরেকে কাউকে ক্ষমা করতে পারে না আর না-ই কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে।' (খুতবা ইলহামীয়া–রূহানী খাযায়েন-১৬তম খন্ড-পৃ:৩১৬।**

অতএব, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ পালনের চেষ্টা করার অর্থই হচ্ছে, এর শিক্ষার উপর সত্যিকার আমল করা; তখনই আমলকারী বা পাঠকারীর প্রতিটি পদক্ষেপ ও কর্ম খোদা তাআলার সন্তুষ্টির অধীন বলে গণ্য হবে। এ (কুরআনের) শিক্ষার মধ্যে কঠিন কোন কিছু নেই, বরং এটি হুবহু প্রকৃতি সম্মত। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তাআলা এর উল্লেখ করেছেন। যেমন রোযার নির্দেশাবলীর সাথেই আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

অর্থাৎ **'আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান, তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না।' (সূরা আল্ বাকারা:১৮৬)** এটি একটি নীতিগত ঘোষণা। কুরআন করীমের শিক্ষা প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এর (শিক্ষার) মধ্যে কেবল স্বাচ্ছন্দ্যই– স্বাচ্ছন্দ্য। তোমাদের শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী তোমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তিনি তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। এছাড়া এই শিক্ষা সেই উচ্চ 'মান' সম্পর্কে তোমাদেরকে অবগত করে, যে 'মান' তোমাদেরকে খোদা তাআলার নিকটবর্তী করে দেয়।

অতঃপর একস্থানে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

অর্থাৎ **'নিশ্চয় আমরা উপদেশের জন্য কুরআনকে সহজ করেছি, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?' (সূরা আল্ কমর:১৮)** উপদেশ দিতে হবে বলেই উপদেশ দেয়ার কথা এখানে বলা হয় নি, উপদেশ দিলাম আর সমস্যার নিরসন হয়ে গেল (তা নয়) বরং এর অর্থ এই উপদেশাবলী গ্রহণ করো আর এর প্রতি অনুশীলন করো। যদি মনে করা হয় যে, এটি কঠিন শিক্ষা, তবে তাও ভুল ধারণা। এটি সেই খোদার বাণী যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং

প্রত্যেক মানুষের যোগ্যতা ও সামর্থ সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান রয়েছে। সেই খোদা এই ঘোষণা করেন, তাঁর উপদেশাবলী এবং কুরআনের শিক্ষার প্রতি আমল করা মানবের সামর্থ এবং প্রকৃতির সাথে হুবহু সামঞ্জস্যপূর্ণ। এরপরও তুমি কি এই ভাবনায় পড়ে থাকবে যে, কীভাবে এর প্রতি আমল করবো? এই শিক্ষামালার উপর আমল করো, তাহলে মহানবী (সা.)-এর বাণী অনুযায়ী অগণিত নিয়ামতরাজির উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হবে।

অতঃপর এই কুরআনে পূর্বের জাতি সমূহের ঘটনাবলী এজন্যই বর্ণনা করা হয়েছে যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো, আর খোদা তাআলার সন্তুষ্টি মোতাবেক নিজেদের কর্ম সমূহ সম্পাদন করো, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর যেসব বিপদাবলী, শাস্তি ও আযাব নেমে এসেছিল তা থেকে রক্ষা পাও।

খোদা তাআলা আরেকটি আয়াতে বলেছেন, এই কুরআন করীমের শিক্ষা চিরন্তন। বলেন,

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا
مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

'আল্লাহর রাসূল পবিত্র সহিফা পাঠ করে, তাতে চিরস্থায়ী শিক্ষা সমূহ সন্নিবেশিত রয়েছে।' (সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্:৩-৪)

এ সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন। একটি বিবরণ আমি পড়ছি। তিনি (আ.) বলেন, 'কুরআন আনয়নকারী সেই মর্যাদা রাখে যে,

يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

(সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্:৩-৪) এমন একটি গ্রন্থ যাতে সকল গ্রন্থ ও সব সত্য বিদ্যমান রয়েছে। কিতাবের সাধারণ অর্থ ঐসব উত্তম কথামালা, যেগুলোকে মানুষ স্বভাবতই অনুসরণযোগ্য মনে করে।' (মলফুযাত-১ম খন্ড-পৃ:৫১-৫২-রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত) ঐসব বিষয় যা স্বভাবতই মানুষ আমল ও অনুকরণের যোগ্য মনে করে, আর (আমল) করাও উচিত।

তিনি (আ.) বলেন, **'কুরআন শরীফ প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানের সমষ্টি, আজেবাজে গালগল্পে ভরা কোন ভান্ডার নয়।'** (এতে কোন বেহুদা কথা নেই)। **'প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিজেই প্রদান করে আর প্রত্যেক প্রয়োজন পূরণের উপকরণ এতে বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেক দিক থেকে এটি এক দৃষ্টান্ত ও নিদর্শন। কেউ যদি অস্বীকার করে, তবে আমরা প্রত্যেক দিক থেকে এর সত্যতা প্রমাণ করতে ও দেখাতে প্রস্তুত আছি।'** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সময় এই চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। তিনি (আ.) বলেন, **'বর্তমানে তৌহিদ ও খোদা তাআলার অস্তিত্বের উপর প্রচন্ড আক্রমন হচ্ছে'**- (এ যুগে পুনরায় আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অনেক বেশি বই-পুস্তক লেখা হচ্ছে, তাই বর্তমানে অনেক বেশি পবিত্র কুরআন পাঠ করা প্রয়োজন) তিনি (আ.) বলেন, **'আজকাল তৌহিদ ও খোদা তাআলার অস্তিত্বের উপর শক্তিশালী আক্রমন হচ্ছে। খ্রিষ্টানরাও শক্তিশালী আক্রমন চালিয়েছে আর লিখেছে। কিন্তু যা কিছু বলেছে ও লিখেছে, তা ইসলামের খোদার সম্বন্ধেই লিখেছে। কোন মৃত, ক্রুশবিদ্ধ বা দুর্বল খোদার সম্বন্ধে নয়। আমরা দাবীর সাথে বলছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব ও সত্তার বিরুদ্ধে কলম ধরবে, তাকে পরিশেষে ইসলামের খোদার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কেননা (মানব) প্রকৃতির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে তাঁর দেখা মেলে আর প্রকৃতিগতভাবে মানুষ সেই খোদার ছাপই নিজের মাঝে ধারণ করে। মোটকথা, এই সব লোকের পদক্ষেপ যখন উঠবে তখন তা ইসলামের পানেই উঠবে।'** তিনি (আ.) বলেন, **'এটিও এক মহাসম্মান। যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের এই অলৌকিক নিদর্শন অস্বীকার করে, তবে যেন এক দিক দিয়েই আমাদেরকে পরীক্ষা করে নেয়। অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তি কুরআনকে খোদার বাণী মনে না করে তবে এই আলো এবং বিজ্ঞানের যুগে এমন দাবীকারক খোদা তাআলার অস্তিত্বের পক্ষ্যে দলীল-প্রমাণ দিক পক্ষান্তরে আমরাও পবিত্র কুরআন হতে সে সমস্ত দলীল-প্রমাণ বের করে দেখিয়ে দিবো, আর সেই ব্যক্তি যদি খোদা তাআলার একত্ববাদ সম্পর্কে প্রমাণাদি রচনা করে তবে সেসব দলীল-প্রমাণও আমরা কুরআন থেকেই বের করে দেখিয়ে দিবো। এরপর সে ঐ সব দলীল-প্রমাণের স্বপক্ষে দাবী করে লিখুক যে, এগুলো কুরআনে নেই অথবা ঐসব সত্য বা পবিত্র শিক্ষার পক্ষে দলীল-প্রমাণ লিখুক যা সম্পর্কে তার ধারণা যে, এগুলো পবিত্র কুরআনে নেই। তাহলে এমন ব্যক্তিকে আমরা পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দিবো যে, কুরআনের দাবী:**

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

(সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্:৪) কত সত্য এবং সুস্পষ্ট। অথবা আসল এবং প্রকৃতি সম্মত ধর্ম সম্পর্কে দলীল-প্রমাণ লিখতে চাইলে আমরা সব দিক থেকে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দেখাবো এবং সমস্ত সত্য ও পবিত্র শিক্ষা যে এর মাঝে বিদ্যমান আছে তা জানিয়ে দেবো। মোটকথা, পবিত্র কুরআন এমন এক কিতাব যাতে সকল প্রকার তত্ত্বজ্ঞান এবং সূক্ষ্ম রহস্যাবলী সন্নিবেশিত রয়েছে, কিন্তু তা অর্জন করার জন্য আমি পুনরায় বলছি, সেই পবিত্রকরণ শক্তির প্রয়োজন, যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বলে দিয়েছেন:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

(সূরা আল্ ওয়াকে'আ:৮০)।' (মলফুযাত-১ম খন্ড-পৃ:৫১-৫২-রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত)

অতএব এটি সেই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এবং হেদায়াতের ভান্ডার, যার পাঠকারী এবং (শিক্ষার উপর) আমলকারী সর্বদা আল্লাহ তাআলার কৃপায় হেদায়াতের পথে পরিচালিত থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছিলেন, তা আজও বলবৎ রয়েছে। বরং তাঁর অনুসারীরাও এর প্রতি অনুশীলন করে বিশ্বে প্রমাণ করেছে যে, পবিত্র কুরআনের সত্যতা সর্বকালের জন্য।

ড. আব্দুস সালাম সাহেব যে মতবাদ উপস্থাপন করেছিলেন, তাও খোদা তাআলার একত্ববাদ এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাই প্রমাণ করে। অতএব, আজও যেসব আহমদী বিজ্ঞানী ও গবেষক রয়েছেন তারাও এ সত্যকে দৃষ্টিপটে রেখে চিন্তা-ভাবনা বা অভিনিবেশ করুন তাহলে খোদা তাআলা স্বয়ং আপনাদেরকে পথ দেখাবেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা হেদায়াত লাভের ব্যাপারে বলেন, কুরআনী শিক্ষা অনুযায়ী এতে আধ্যাত্মিক হেদায়াতও আছে আর ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য জ্ঞানের পানে পথ প্রদর্শনের নির্দেশনাও বিদ্যমান রয়েছে, আল্লাহ্ বলেন:

وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

‘এবং কুরআন পাঠ করো, সুতরাং যে হেদায়াত পায় সে মূলত: নিজের জন্যই হেদায়াত পায়।’ (সূরা আন্ নাম্ল:৯৩)

অত:পর তিলাওয়াত করার ফলে পবিত্র কুরআনে হেদায়াত দেখতে পাবে। কিন্তু, সব ধরনের হেদায়েত কেবল সেই পেতে পারে যার ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ অর্থাৎ যে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হবে। কুরআন বুঝার জন্যও পবিত্র হওয়া শর্ত; অন্যথায় বুঝতে পারবে না।

এছাড়া পবিত্র কুরআনের আর একটি দাবী হলো, এতে সবকিছু সংরক্ষিত আছে। মৌলিক নৈতিকতা অর্থাৎ চারিত্রিক শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান পর্যন্ত সবকিছুই এই সুরক্ষিত গ্রন্থে সুপ্তভাবে নিহিত আছে। যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা সুরা ইউনুসে বলেন,

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦٢﴾

‘এবং তুমি যে কোন কাজে ব্যস্ত থাকো না কেনো এবং তার পক্ষ থেকে সমাগত কুরআনের যে কোন অংশ আবৃতি করো না কেন এবং তোমরা, হে মু’মিনগণ! যে কোন কাজ করো না কেন আমরা অবশ্যই তার উপর সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা তাতে মুগ্ধ থাকো। আর তোমার প্রভূর দৃষ্টি থেকে অনু পরিমান বস্তুও পৃথিবীতে এবং আকাশে গোপন নেই আর এর চেয়ে ছোট বা এর চেয়ে বড় তা সব এক উজ্জল কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।’ (সূরা ইউনুস:৬২)

উক্ত আয়াত, আল্লাহ্ তাআলার মহিমার বহিঃপ্রকাশ, প্রত্যেক বস্তুর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ। দৃশ্য-অদৃশ্য, দূরবর্তী-নিকটবর্তী এবং ছোট-বড় সবকিছুই আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞাত। অতএব এই ঘোষণা; মু’মিন, অ-মু’মিন এবং মুসলমান ও কাফির সবার জন্যই সমান, এই মহান কিতাব সম্যক জ্ঞানের অধিকারী খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর এতে সকল প্রকার জ্ঞান, ঘটনাবলী, সতর্কবাণী এবং এর মান্যকারীদের দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধেও বলা হয়েছে। এটি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গ্রন্থ, এ কারণেই এ কিতাব অবতীর্ণ হবার পর আল্লাহ্ তাআলা এর সুরক্ষা নিশ্চিত করেছেন। এটি নাযিল হবার পর, এর অস্বীকারকারীরও পলায়নের কোন পথ খোলা নেই এবং এর মান্যকারীদেরও এর (শিক্ষার) উপর অনুশীলন না করার ক্ষেত্রে অজুহাত দেখানোর কোন উপায় নেই। তাই মান্যকারীদেরও সর্বদা স্মরণ রাখা উচিৎ, যখন সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছো, তখন নিজেদের ক্বিবলাও (দিক) ঠিক রাখতে হবে। নিজ নিয়্যতকেও সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। আত্মবিশ্লেষণও করতে হবে। কেবল একথা বলা যে, ‘আমরা কুরআন পড়ি আর এটিই যথেষ্ট’, এটি যথেষ্ট নয়। কেবল একথা বলা যে, আমরা এর মাধ্যমে বিশ্বকে আমাদের প্রতি আহ্বান করি, এটিও যথেষ্ট নয়; বরং দেখা দরকার, এটি পাঠ করার ফলে আমাদের মাঝে কি-কি পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এটিও দেখা দরকার যে, এসব পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্যরা আমাদের থেকে কি শিখছে, তাদের মধ্যে কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে; ইসলামের প্রতি কতটা তাদের আকর্ষণ জন্মাচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা কারো আত্মীয় নন। তিনি যখন সব কথা সুস্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করে দিয়েছেন, তিনি যখন আপন প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যুগের শিক্ষককে প্রেরণ করেছেন, তাই তাঁর (আ.) মান্যকারীদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে, যদি তোমরা নিজেদের উপর সেই শিক্ষা কার্যকর করার চেষ্টা না করে থাকো, তবে কেনো করো নি? সে সম্পর্কে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। আর অস্বীকার কারীদেরকেও জবাব দিতে হবে। তাদেরকেও জবাবদিহি করা হবে, যখন এত প্রাঞ্জল শিক্ষা এবং নিদর্শনাবলী প্রকাশ পেয়েছে তা সত্ত্বেও তোমরা যুগ ইমামকে গ্রহণ করলে না কেন? অস্বীকারকারীদের যতটুকু সম্পর্ক, তাদের বিষয় আল্লাহ্‌র হাতে ন্যস্ত। তিঁনি কী ব্যবহার করবেন (তা তিঁনিই ভাল জানেন)। কিন্তু আমাদেরকে নিজেদের বিষয় পরিষ্কার রেখে এই কিতাব পাঠ করা এবং এর প্রতি অনুশীলন করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের কল্যাণাদি উল্লেখ করতে গিয়ে

বলেন:

'আমাদের কাছে যদি কুরআন না থাকতো, আর হাদীসের এসব সংকলন আমাদের গৌরবময় বিশ্বাস ও ঈমানের মূল ভিত্তি হতো, তবে আমরা লজ্জায় অন্যান্য জাতিকে মুখও দেখাতে পারতাম না। আমি যখন কুরআন শব্দ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলাম, তখন আমার কাছে স্পষ্ট হলো যে, এই বরকতময় শব্দে এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী আছে আর তা হলো, এই কুরআনই পাঠযোগ্য একমাত্র গ্রন্থ। আর এক যুগে এটি-ই সবচেয়ে বেশী পঠিত কিতাব হবে, যদিও অন্যান্য পুস্তকাদিও এর সাথে পড়া হবে, সে সময় ইসলামের সম্মান রক্ষার্থে এবং মিথ্যার মূল উৎপাটনের জন্য কেবল এই কিতাবটি-ই পাঠের যোগ্য থাকবে এবং অন্যান্য কিতাব নিশ্চিতরূপে পরিত্যাজ্য হবে। ফুরকানেরও এই একই অর্থ, অর্থাৎ এই একটি কিতাবই সত্যকে– মিথ্যা থেকে পৃথককারী সাব্যস্ত হবে। আর কোন কিতাব বা হাদীস এ মর্যাদার সমকক্ষ হবে না। তাই অন্য সকল গ্রন্থ পরিত্যাগ করো আর রাত দিন আল্লাহ্‌র কিতাব পড়। সে ব্যক্তি বড়ই বেঈমান যে কুরআনের প্রতি মনোযোগ দেয় না বরং অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি দিন-রাত ঝুঁকে থাকে। আমাদের জামাতের মনপ্রাণ দিয়ে কুরআনের প্রতি মনোনিবেশ এবং অভিনিবেশে রত থাকা উচিৎ, আর হাদীসের প্রতি মনোনিবেশ পরিহার করা উচিত। বড়ই পরিতাপের বিষয়! যে পবিত্র কুরআনের সেই সম্মান করা হয় না বা মূল্যায়ন করা হয় না যতটা হাদীসকে করা হয়। এখন পবিত্র কুরআনের অস্ত্র হাতে নাও কেননা, এতেই তোমাদের বিজয় নিহিত, এই আলোর সামনে কোন অন্ধকার দাঁড়াতে পারবে না।' (মলফুযাত-১ম খন্ড-পৃ:৩৮৬-নবসংস্করণ)

এখানে একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **'হাদীস পরিত্যাগ করো আর কুরআন পড়'**, কিন্তু অন্য স্থানে বলেছেন, **'কেবল হাদীসের উপরে ভরসা করো না বরং যেসব হাদীস কুরআন সম্মত তা গ্রহণ করো আর বাকীসব পরিহার করো।' (ইযালায়ে আওহাম-রূহানী খাযায়েন-৩য় খন্ড-পৃ:৪৫৪)**

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **'পবিত্র কুরআনকে বাদ দিয়ে সফলতা লাভ করা অসম্ভব এবং অবাস্তব বিষয়, আর এমন সফলতা যার সন্ধানে এরা লেগে আছে তা অলীক বিষয়। সাহাবাদের (রা.) দৃষ্টান্ত নিজেদের সামনে রাখো। দেখো! তারা যখন খোদার রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ করেছেন এবং ধর্মকে, পার্থিব বিষয়াদীর উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন, তখন তাদের সাথে কৃত আল্লাহ্ তাআলার ঐসব প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা পেয়েছে। প্রাথমিক যুগে বিরোধীরা হাসি-ঠাট্টা করে বলতো, স্বাধীনভাবে বাইরে চলাফেরার মুরোদ নেই আবার বাদশাহ্ হবার দাবী করছে। কিন্তু দেখো, মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে বিলীন হয়ে তারা তা লাভ করেছে যা শত-শত বৎসরেও তাদের ভাগ্যে জোটেনি।' (মলফুযাত-১ম খন্ড-পৃ:৪০৯, রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত)**

অতএব আজও পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর আমলের মাঝেই আমাদের বিজয় নিহিত। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আর আহমদীয়াতের বিজয়কে নিকটতর করুন।

এখন একটি দুঃখজনক সংবাদও দিতে চাই। আমাদের কানাডার একজন মোবাল্লেগ সিলসিলাহ্ মুকাররাম মুহাম্মদ তারেক ইসলাম সাহেব দু'দিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তার যকৃত বা Spleen ক্যান্সার হয়েছিল আর এ রোগেই তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। কয়েক দিন অসুস্থ্য থাকার পর তিনি মারা গেলেন। তিনি ১৯৭৮ সালে শাহেদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এরপর পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে কাজ করেছেন। এরপর তিনি ওকালাতে উলিয়া রাবওয়াহ্‌র কেন্দ্রীয় দপ্তরেও কাজ করেছেন। তাকে ইতালী প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু ভিসা না পাবার কারণে কয়েক মাস পরেই ফিরে আসেন। এরপর ওকালাতে তবশীরে কাজ করেছেন। ১৯৯৩ সাল থেকে কানাডাতে খিদমত করছিলেন। ভ্যাঙ্কুভার ও ওটোয়াতে মুরব্বী হিসেবে কাজ করছিলেন। অত্যন্ত মিশুক, স্নেহশীল এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং গরিবদের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। জামাতী রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন আর আনুগত্যের ব্যাপারে সদা সচেতন ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালবাসা রাখতেন; এটি তো প্রত্যেক আহমদীর মাঝেই আছে, প্রত্যেক মুরব্বীর ভেতর থাকা উচিৎ আর রয়েছে, কিন্তু অনেকের ভালবাসা হয়ে থাকে অসাধারণ, তিনিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কখনো কোন অভিযোগ করতেন না। অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও কঠোর পরিশ্রম করে সকল কাজ করতেন। কানাডাতে আমার সফর হলে মোলাকাতের জন্য বা অন্যান্য কাজের জন্য প্রাইভেট সেক্রেটারীর দপ্তরে তিনি ডিউটি দিতেন। আর সর্বদা খোশ মেজাজে, অত্যন্ত পরিশমের সাথে কাজ করতেন।

আল্লাহ্ তাআলা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন। তিনি বিধবা স্ত্রী এবং পাঁচ কন্যা রেখে গেছেন। দু'জনের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। তার ছোট মেয়ের বয়স সম্ভবত বার বছর। তাদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সবাইকে ধৈর্য এবং সাহস দিন আর তাদেরকে স্বীয় নিরাপত্তায় আগলে রাখুন। আমাদের এখানকার মোবাল্লেগ মজীদ সিয়ালকোটি সাহেব– তারেক ইসলাম সাহেবের ভগ্নিপতি হন। তার আর এক ভাই হাফিয তাইয়্যেব আহমদ ঘানাতে আছেন, তিনি জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তাআলা তার সকল আত্মীয়-স্বজনকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন। এখন জুমুআর নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াবো, ইনশাআল্লাহ্।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ এবং কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের যৌথ উদ্যোগে অনূদিত)

নেযামে নও

(নব বিশ্বব্যবস্থা)

হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাযিআল্লাহু আনহু
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা

(৭ম কিস্তি)

ভবিষ্যতে যুদ্ধ করবে না মর্মে মুচলেকা নিয়ে যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তিদান করার বিধান ইসলামে রয়েছে:

মহানবী (সা.) এর আমলী নমুনা থেকে সাব্যস্ত হয় যে, করুণা করে যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিদানকালে এই মুচলেকা নেয়া যেতে পারে যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সে আর কখনও যুদ্ধ করতে আসবে না। কেননা হতে পারে, কোন ব্যক্তি একবার মুক্তি পেয়ে পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবারও কোন যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এজন্য রাসূল করীম (সা.) এরূপ শর্ত আরোপ করার অনুমতি দিয়েছেন। স্বয়ং রাসূল করীম (সা.) এর যুগে এমনই এক ঘটনা ঘটেছে যা যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদানের ক্ষেত্রে ওই বিপদজনক আশঙ্কার প্রতি আলোকপাত করছে। রাসূল করীম (সা.) একবার আবু উজ্জাহ নামীয় এক যুদ্ধবন্দীকে মুক্তিদান করেন। এই ব্যক্তিকে **'বদর'** এর যুদ্ধে বন্দী করা হয়েছিল। রাসূল করীম (সা.) তার থেকে এই মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেন যে ভবিষ্যতে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না।

কিন্তু **'ওহুদ'**এর যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুণর্বার সে লড়াইয়ে অংশ নেয়। আবার **আল হামরা আল আসাদ** এর যুদ্ধেও সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অংশ নেয় আর পরাজিত হলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। অতএব যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে ইসলাম দু'টি পন্থার কথা বলেছে:

১। কৃপা প্রদর্শন করে তাদের মুক্তি দাও, আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে–

২। যুদ্ধের ক্ষতি নির্ধারণ পূর্বক মুক্তিপণ মূল্য ধার্য করে তা আদায় করা সাপেক্ষে তাদেরকে মুক্ত করে দাও।

যুদ্ধবন্দীদের দিয়ে কাজ করানো:

হ্যাঁ, যতদিন তারা মুক্তিপণ পুরোপুরি আদায় না করছে ততদিন তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো বৈধ। কেননা যুদ্ধবন্দী আটক রাখার উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের শক্তি খর্ব করা। বন্দীদের একত্রিত করে যদি তাদেরকে খাওয়া দাওয়া করানো চলতে থাকে আর তাদের থেকে কোন কাজই নেয়া না হয় যদ্বারা প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় নিজেদের উপকার হতে পারে, তাহলে প্রতিপক্ষের শক্তি তো কমবে না বরং বেড়ে যাবে। অবশ্য এর সমাধানে ইসলাম আর বিদ্যামান রাষ্ট্রসমূহের কার্যপদ্ধতি এ দু'এর মাঝে বিস্তর ফারাকও রয়েছে।

যুদ্ধবন্দীদের দিয়ে কাজ করানো কালে তাদের সামর্থ্যের কথা বিবেচনায় রেখে খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দিক নির্দেশনা:

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা বড় বড় কর্ম-কর্তা তাদের তো আজকাল তেমন কিছু বলাই হয় না, তবে সাধারণ যুদ্ধবন্দীদেরকে চাপ দিয়ে কাজ করানো হয়। তাই ইসলাম বলে-

১। কোন কয়েদী থেকে তুমি তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ নিও না।

২। নিজে যা খাও কয়েদীদেরকেও তা-ই খাওয়াও। কাপড় নিজে যেমন পরো তাকেও তেমনি পরাও।

এখন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো, সত্যি করে বলুন, তারা কী এমনটাই করে থাকেন? ইংরেজ, জার্মান ও জাপানীরা কয়েদীদের সেই সবই খাওয়ান যা নিজেরা খেয়ে থাকেন? জার্মানরা কী ইংরেজ কয়েদীদের সেই সব খাবারই দেন যা তারা নিজেরা খান? অবশ্যই তারা এমনটি করেন না।

কিন্তু ইসলাম বলে নিজে যে খাবার খাও তাই এদেরকে খাওয়াও, আর নিজে যে পোশাক পরো, ওদেরও তাই পরাও। আর সাহাবা *রেযওয়ানাল্লাহু আলাইহিম* এ ব্যাপারে এত সজাগ ও সচেতন ছিলেন যে, একবার সাহাবারা এক ভ্রমণে বের হয়েছিলেন আর তাদের সাথে কতিপয় গোলামও ছিল। সেই গোলামেরা নিজেরাই বর্ণনা দেয় যে, যাত্রাপথে খেজুর যখন শেষ হয়ে আসছিলো সাহাবারা স্থির করলেন, এখন থেকে গোলামদের খেজুর খেতে দেবেন আর তারা নিজেরা খেজুরের বীচি চিবিয়ে খেয়ে নিবেন। আর অবশিষ্ট পথযাত্রায় তারা তদ্রুপই করলেন। এমন কী! যথেষ্ট পরিমাণ খেজুর বীচিও তারা পেতেন না যদ্বারা ক্ষুধা পুরোপুরি নিবারণ করা যায়। অতএব, এই যে নির্দেশ যা ইসলাম দিয়েছে, নিজে যা খাও, কয়েদীদের

তাই খাওয়াও, এ দৃষ্টান্ত জগতের কোথাও পাওয়া যায় না; কেবল সাহাবায়ে কেরাম *রেযওয়ানাল্লাহু আলাইহেম* গণই রয়েছেন যারা এই নমুনা জগত সমক্ষে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করেছেন।

ইসলামের বিধানে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি রূঢ় আচরণ করা আর তাদের মারধর করার প্রতিফল:

আরও বলা হয়েছে, ওদের আঘাত করো না, প্রহার করো না। কোন ব্যক্তি যদি ভূলবশত: তাকে (যুদ্ধবন্দীকে) মারধর করে বসে তবে সেই গোলাম যাকে মারধর করা হয়েছে তৎক্ষনাৎ সে মুক্ত হয়ে যাবে। হাদিসের বর্ণনায় এসেছে একবার মহানবী (সা.) নিজ ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে দেখলেন যে এক সাহাবী কোন গোলামকে মারধর করছে। সেই সাহাবী নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমি সেই মারধর রত থাকা অবস্থাতে পিছন থেকে রাসূল করীম *সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম* এর এই কথা শুনতে পেলাম যে, 'কী করছো তুমি! এটা জাহেলিয়তের কাজ'। আজকাল তো লোকেরা চাকর বাকরদের হর হামেশাই মারধর করে, আর এটাকে দোষনীয় কিছু মনে করে না। কিন্তু এক গোলামকে প্রহার করায় রাসূল করীম (সা.) সেই সাহাবী (রা.) কে সাবধান করলেন আর বললেন 'তুমি করেছোটা কী! যেভাবে এই গোলামের ওপর তোমার কর্তৃত্ব রয়েছে তার চেয়েও বহুগুণে কর্তৃত্ব রয়েছে তোমার ওপর আল্লাহ তাআলার। সেই সাহাবী (রা.) বলেন, এই কথা শুনে আমি ভয়ে কেঁপে উঠলাম আর বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) আমি একে মুক্ত করে দিচ্ছি। তিনি (সা.) বললেন, 'তুমি যদি একে মুক্ত না করতে তবে নরকে যেতে'।

অনুরূপভাবে আরেক জন সাহাবা (রা.) বর্ণনা করেন-

আমরা ছিলাম সাত ভাই, যুদ্ববন্দী কেবলমাত্র একটি বাঁদীই আমাদের জন্য বরাদ্দ হলো।

আমাদের সবার ছোট ভাইটি একবার কোন এক দোষে তাকে থাপ্পড় মারল। রাসূল (সা.) এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি (সা.) বললেন, 'একে থাপ্পড় মারার জরিমানা কেবল একটিই, আর তা হলো একে মুক্তি দাও, স্বাধীন করে দাও'।

অতএব, তারা তাকে মুক্তি দিয়ে দিল। এটা এমন কোন গুরুতর মারধর করা নয়, তবুও যুদ্ধবন্দী এক বাঁদীকে এক আধটা থাপ্পড় দেয়াও রাসূল (সা.) এর কাছে অপসন্দনীয় ছিল। আর এর কাফফারা কেবল একটাই নির্ধারিত বলে তিনি (সা.) জানিয়েছেন, আর সেইটা হলো, তাকে যেন স্বাধীন করে দেয়া হয়। আজকাল তো মারতে মারতে ক্ষত বিক্ষত করে শরীরে আঘাতের ক্ষতচিহ্ন এঁকে দেয়া হয়।

কিন্তু রাসুল করীম *সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম* বলেন, লাঠি পেটা করো না বরং তুমি যদি চর থাপ্পড়ও মেরে বস, তবে এর অর্থ এটাই যে, তুমি দাসী বাঁদী রাখবার যোগ্য নও আর তুমি নিজের আচার ব্যবহার দিয়ে সাব্যস্ত করে দিয়েছো যে, কাউকে তোমার অধীনস্ত করে রাখা যায় তুমি তেমনটা নও, তাই তুমি সত্ত্বর তাকে স্বাধীন করে দাও।

বিবাহ যোগ্য যুদ্ধবন্দীদের বিবাহ করানোর ব্যাপারে ইসলামের দিক নির্দেশনা:

রাসূল (সা.) আরও বলেন-

যদি তারা (যুদ্ধবন্দীরা) বিবাহের উপযুক্ত হয় আর পরিণত বয়সের হয় তবে তোমরা তাদের বিবাহ করিয়ে দাও, কেননা জানা নেই যে তারা কতদিনে মুক্তি লাভ করে।

অতএব এ বিষয়ে কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশনা দান করে বলেছেন-

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

[সূরা নূর ৪র্থ রুকূ, আয়াত ৩৩]

ওয়া আনকিহুল আইয়ামা মিনকুম ওয়াসসালিহীনা মিন ইঁবাদীকুম ওয়া ইমাইকুম

অর্থাৎ–তোমাদের দাস দাসীদের মধ্য থেকে যারা বিবাহযোগ্য তাদের ব্যাপারে আমরা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা তাদের বিয়ে শাদী দিয়ে দাও।

এবারে বল! আজকালকার আন্তর্জাতিক আইন যুদ্ধবন্দীদের সাথে কী এর চেয়েও সুন্দর ব্যবহার করতে শেখায়?

এখন তো যুদ্ধবন্দীদের স্ত্রীদেরকে পর্যন্ত তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয় না। কারণ এটা যে, তারা নিজেরাই এদের বিয়ে করে নেবে। কিন্তু ইসলাম বলে যা কিছু নিজেরা খাও এদেরও তাই খাওয়াও, নিজেরা যেমন পোশাক পরো এদেরও তেমন পোশাকই পরাও। এদের মধ্যে যারা বিবাহের উপযুক্ত তাদের বিয়ে দিয়ে দাও। তাদের প্রতি কখনও কঠোর আচরণ করো না। আর যদি তোমরা কোন সময় তাদের মার দিয়ে বসো তবে এর স্খলন এটাই যে তোমরা তাদের তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দাও। আবার দেখো! আজকাল কোন দেশের কোন সরকার যুদ্ধবন্দীরা ভবিষ্যতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আর অংশ নিবে না, এই অঙ্গীকার নিয়ে যুদ্ধবন্দীদেরকে ছেড়ে দিতে কী রাজী থাকবে? অথবা কেউ কী কোন আক্রমণকারী আগ্রাসী রাষ্ট্রকে পরাভূত করেও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় না করেই ছেড়ে দেয়?

যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ আদায়ের সুযোগ দিয়ে যুদ্ধবন্দীদেরকে ইসলাম রেহাই প্রদান করে:

কিন্তু ইসলাম যুদ্ধের ক্ষতিপূরণও সহজ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে, ওহে তোমরা কৃপা (ইহসান) করে ছেড়ে দাও। আর ইহসান (কৃপা) সমুন্নত রাখা যদি তোমাদের পক্ষে সহনীয় না-ই হয় তাহলে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ নিয়ে ছেড়ে দাও। তবে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ আদায় করা ছাড়া অতিরিক্ত কিছু নয়। হ্যাঁ, পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে, পূর্বে যুদ্ধ হতো ব্যক্তি পর্যায়ে অর্থাৎ একজন যোদ্ধার সাথে অপর এক যোদ্ধার, এজন্য ব্যক্তির কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হতো। কিন্তু আজকাল যুদ্ধ হয় বিবদমান রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর মধ্যে। এজন্য এখন পদ্ধতি এটা যে, জাতিকেই যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। পূর্বকালে যেহেতু নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না, ফলে দেশের নাগরিকদের ওপর যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য একেকজনের ওপর একেক ধরনের দায়িত্ব পড়তো, এজন্য সে কালে বন্দী আটক রাখার উত্তম পন্থা এটাই ছিল যে, তাদেরকে অর্থাৎ যুদ্ধ বন্দীদেরকে নাগরিকদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হতো যাতে তারা প্রত্যেকে (বিজয়ীরা) ওদের (যুদ্দবন্দীদের) থেকে সংঘটিত যুদ্ধের খরচে যোগানো তাদের নিজ নিজ অংশ উশুল করে নিতে পারে। কিন্তু দেশীয় সরকারের নিয়মিত সেনাবাহিনী যখন থাকে যুদ্ধের ব্যয়ভার মেটানোর দায়িত্ব তখন নাগরিকদের ব্যক্তি পর্যায়ে ন্যস্ত হয় না, তাই সে ক্ষেত্রে যুদ্ধবন্দীদের নাগরিকদের মাঝে বন্টন করে না দিয়ে বরং দেশের সরকারের নিয়ন্ত্রণাধিকারে রাখতে হয়। আর যুদ্ধে পরাস্ত দেশ, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিলে যুদ্ধবন্দীদের কাজ-কর্মে খাটানো যাবে না, বরং তাদের ছেড়ে দিতে হবে।

এবারে বলো! বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করে মুক্ত হবার অধিকার থাকা অবস্থাতে মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদেরকে কেন তারা ছাড়িয়ে নেবে না? যদি সে নিজে মুক্তিপণ পরিশোধের সামর্থ্য না রাখে তবে তার আত্মীয় স্বজন মুক্তিপণ পরিশোধ করতে পারে। আর তারাও যদি মুক্তিপণ দিতে না পারে তবে বন্দীদের দেশীয় সরকার মুক্তিপণ দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে নিতে পারে। অর্থাৎ কোন অবস্থাই এমন রাখা হয় নি, যাতে তাদের (বন্দীদের) মুক্তি পাবার দরজা খোলা রাখা না হয়েছে।

মুক্তিপণ পরিশোধে নেহায়েতই অসমর্থ্য যারা তাদের মুক্তি লাভের উপায়:

কেউ সম্ভবত: বলবে, হতে পারে এক গরীব ব্যক্তি, যে নিজে মুক্তিপণ পরিশোধের সামর্থ্য রাখে না, তার দেশীয় সরকারও জালেম তাকে মুক্ত করার কোন চিন্তা ভাবনাই করছে না, আত্মীয় স্বজনরা তার ব্যাপারে উদাসীন ও মন্দ স্বভাবের, তারা চাইছে যে, সে বন্দী অবস্থাতেই থাকুক যাতে তার সহায় সম্পদ নিজেরা করায়ত্ত করে ভোগ দখল করতে পারে। অপরপক্ষে ওই যুদ্ধবন্দী ব্যক্তির মনিবেরও অবস্থা এমন করুণ যে, মুক্তিপণ না নিয়ে সে যুদ্ধবন্দীকে ছাড়তে পারছে না। কেননা, তার বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণরূপে এমনই যে, যত পরিমাণ টাকা-পয়সা যুদ্ধে সে ব্যয় করেছে তাতে তার আর্থিক অবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। তাই, এমন পরিস্থিতিতে সেই যুদ্ধবন্দী নিজের মুক্তির জন্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবও কুরআন করীম প্রদান করেছে। বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم
مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

(সূরা নূর ৪র্থ রুকূ, আয়াত ৩৪)

ওয়াল্লাযিনা ইয়াবতাগুনাল কিতাবা মিম্মা মালাকাত আইমানুকুম ফাকাতিবুহুম ইন আ'লিমতুম ফিহিম খায়রান ওয়া আতুহুম মিন মালিল্লাহিল্লাযি আতাকুম

অর্থাৎ–ওই ব্যক্তি, যাকে খোদা তাআলা তোমাদের গোলাম বানিয়ে দিয়েছেন, যে তোমাদের করায়ত্তে রয়েছে আর যার ওপর তোমাদের আধিপত্য আছে, সে যদি তোমাকে বলে, 'মনিব! আমাকে ছাড়িয়ে নেয়ার কেউই নেই, আমার কাছে টাকা কড়িও নেই যে আমি মুক্তিপণ পরিশোধ করে মুক্তি নিতে পারি, আমি হত দরিদ্র নি:স্ব। আমি আপনার সাথে এই চুক্তিবদ্ধ হচ্ছি যে, আপনার নির্ধারিত মুক্তিপণের টাকা দুই বা তিন বছর বা চার বছরের মধ্যে আমি পরিশোধ করে দিব। আর এজন্য এই পরিমাণ মাসিক কিস্তি আপনাকে পরিশোধ করতে থাকবো। আপনি আমায় মুক্ত করে দিন'। তাহলে **ফা কাতিবুহুম ইন আ'লিমতুম ফীহিম খায়রান...** একথার ওপর তুমি বাধ্য যে তাকে মুক্ত করে দাও এবং তার মুক্তিপণের মূল্যমানের কিস্তি নির্ধারণ করে নাও যাতে তোমার জানা থাকে যে এই বন্দী সেই পরিমাণ টাকা রোজগারের সামর্থ্য রাখে বরং তোমার উচিত যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন, তা থেকে তাকে সাহায্য করো অর্থাৎ তাকে কিছু পূঁজিও দিয়ে দাও যাতে এর দ্বারা টাকা রোজগার করে নিজের মুক্তিপণ পরিশোধ করতে সে সক্ষম হয়। এভাবে শর্ত নির্ধারণ হওয়ার মুহূর্ত থেকেই সে নিজ কাজ-

কর্মে তেমনই স্বাধীন হয়ে যাবে যেমনটা স্বাধীন থাকে কোন মুক্ত ব্যক্তি আর তেমনিভাবে সে নিজ আয়কৃত সম্পদের স্বত্তাধিকারীও হবে।

এসব প্রেক্ষিত থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি গোলামই থেকে যায় ও মুক্ত স্বাধীন হতে চেষ্টা না করে, তবে এর অর্থ হলো–সে নিজেই গোলাম (পরাধীন) থাকতে চায় আর গোলামিতেই তার আনন্দ লাভ হয়। আসল কথা, ইসলামী শিক্ষার আওতায় জাগতিক যুদ্ধ বিগ্রহে গোলাম (বা দাস) বানানো যেতে পারে না, বরং কেবল সে সব যুদ্ধেই বন্দী করা যেতে পারে যা ধর্মভিত্তিক যুদ্ধ। তবে এমন যুদ্ধবন্দীদের গোলাম করে রাখার ব্যাপারেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে প্রথম তো ইহসান (কৃপা) করে তাদের ছেড়ে দাও। আর যদি তা করতে না পারো তবে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দাও। এটা আবশ্যকীয় নয় যে, বন্দী নিজেই মুক্তিপণ দিবে, তার আত্মীয় স্বজনরাও দিতে পারে, স্বদেশের সরকারও দিতে পারে। আবার, স্বদেশের গভর্ণমেন্ট উদাসীন হলে আত্মীয় স্বজনেরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, আর সে নিজেও হত দরিদ্র হলে তবে সে বলতে পারে, 'এসো! আমার সাথে নিস্পত্তি করে নাও যে আমার ওপর যুদ্ধের জরিমানা কী পরিমাণ নির্ধারিত হচ্ছে, আর সেই নির্ধারিত জরিমানা পরিশোধের জন্য আমাকে এতটা সময় সীমা দিয়ে দাও। আমি সেই সময়সীমার মধ্যে জরিমানার এই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মাসিক কিস্তিতে উক্ত যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ স্বরূপ দিয়ে দেব। এই চুক্তিনামা লিখিত হওয়ার পর পরই সেই বন্দী মুক্ত হয়ে যাবে। আর মনিবের কোন অধিকার থাকবে না যে ওই চুক্তিনামায় কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। চুক্তিনামায় প্রতিবন্ধকতা কেবল সেই পরিস্থিতিতে বৈধ হতে পারে যদি তাতে মঙ্গল না থাকে অর্থাৎ পুনরায় যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে যায়, অথবা সেই বন্দী পাষন্ড প্রকৃতির বা নির্বুদ্ধিসম্পন্ন হয় বা নিজে উপার্জন করতে সক্ষম না হয়, অথবা এ আশঙ্কাও থাকে যে, লাভ করার পরিবর্তে সে ক্ষতিই বেশি করবে।

চুক্তির শর্তে ইসলাম তাকে (যুদ্ধবন্দীকে) সহায়তা করতে মূলধনের যোগান দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছে আর সেই মূলধন হয় মনিব দিক নয়তো দেশের সরকার দিক ।

বন্দীদের মুক্তিদান করতে ইসলামে যারপর নাই প্রচেষ্টা:

এমনটা হতে পারে, কোন ব্যক্তি বলবে পাগল বা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্নদের শর্তসাপেক্ষে চুক্তিভিত্তিক মুক্তি প্রদান স্থগিত করে রাখা বৈধ হলে, তবে তো লোকেরা সুস্থ্য ও ভালো জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন বন্দীদেরকেও **'বেকুফ'** আখ্যায়িত করে তাদেরকে নিজেদের গোলাম (চাকর) বানিয়ে রাখবে। তবে তো আর মুক্তিলাভ হচ্ছেই না। এর জবাব হলো, ইসলামী বিধিমালায় এ অবস্থাতে সে সরকারের কাছে আবেদন করতে পারবে যে, আমি সুস্থ্য জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন একজন মানুষ, উপার্জন করতেও সক্ষম। কিন্তু আমার মনিব ইচ্ছাকৃতভাবে স্বজ্ঞানে আমাকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। এমন অবস্থায় বিচারক বিচারকার্য সমাধা করে তার মুক্তি পাবার অধিকার তাকে প্রদান করবেন। উদ্দেশ্য হলো-

এমন কোন পরিস্থিতি নেই যাতে গোলামদের (দাস -দাসীদের) মুক্তিলাভের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নি। প্রথমত মনিবদের বলা হয়েছে–সে ইহসান (করুণা) করে মুক্ত করে দিক। দ্বিতীয়ত মনিব যদি তা করতে না পারে তাহলে গোলামকে অধিকার দেয়া হয়েছে সে যুদ্ধের মুক্তিপণ পরিশোধ করে মুক্তি নিয়ে নিক। জরিমানা পরিশোধের সামর্থ্য যদি না রাখে তবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিক আর বলে দিক যে আমি এত কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করে দেবো, আমাকে দুই বা তিন বছরের সময় সীমা দিন। এরূপ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরই কার্যত সে মুক্ত হয়ে যাবে। তবে শর্তের পরও কেউ যদি বলে যে আমি মুক্ত হতে চাইনা তাহলে স্বীকার করে নিতে হবে যে তার কাছে এই গোলামী করা (দাসত্ব করা) স্বাধীনতার চেয়েও উত্তম। আর তাই বাস্তবতা হলো এটাই যে সাহাবা কেরাম *রেযওয়ানাল্লাহু আলাইহেম* গণের অধিনস্ত যে গোলামেরা (দাস-দাসীরা) ছিল, রাসূল করীম *সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের* নির্দেশের আওতায় তাদেরকে এত আরাম ও সাচ্ছন্দ্যে সাহাবারা রাখতেন যে, তাদের নিজেদের স্বাধীন জীবন যাপনের চেয়ে সাহাবাদের গোলামী করাটাই তাদের কাছে উত্তম বোধ হতো।

যুদ্ধবন্দী দাসদের সাথে সাহাবাদের সদাচারের নমুনা:

সাহাবারা যা কিছু খেতেন তাই দাসদেরও খাওয়াতেন। যেমন কাপড় নিজেরা পড়তেন ওদেরও তাই পড়াতেন। তাদেরকে দৈহিক শাস্তি দিতেন না। তাদের থেকে এমন কাজ নিতেন না, যা করতে তারা অনীহা দেখাতো বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করতো। আর কাজ নিতে গিয়ে তাদের সাথে নিজেরাও অংশ গ্রহণ করতেন। মুক্তির দাবী জানালে তৎক্ষণাৎ মুক্তিদান করতেন অবশ্য নির্ধারিত জরিমানা আদায় সাপেক্ষে। এতসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করবার পর গোলামেরা অন্তর থেকেই মুক্তি চাইতো না, তারা জানতো যে এখানে আমরা ভাল ভাল সব খাবার পাচ্ছি আর মনিবেরা আগে আমাদের খাওয়ায় পরে নিজেরা খায়, নিজঘরে ফিরে গেলে তো সাদামাটা রুটিই খেতে হবে। এজন্য তারা মুক্তির জন্য দাবী উত্থাপনই করতো না। সুতরাং তারা যদিও গোলাম ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তর বিমুগ্ধ ছিল। আর এ মুগ্ধতা এমনই ছিল যে, হযরত খাদিজা (রা.) এর গোলাম যায়েদ বিন হারিস (রা.) নিজে মুক্তি নেয়ার চেয়ে আঁ হযরত (সা.) এর সেবা করাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (চলবে)

ভাষান্তর : **মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্**

সংস্কারকের আবশ্যকতা

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

বিশ্ব প্রভু মহান আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি রাজ্যে মানুষের স্থান সর্বোচ্চ। দু'চোখ যে দিকে যায়, যা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, সৃষ্টির সব কিছুই মানুষের কল্যাণের জন্য। মানুষেরই সুখ-শান্তি ও সম্ভোগের নিমিত্ত বিশ্ব পালনকর্তা দয়াময় প্রভু যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করে তাঁর সৃষ্টির সেরা মানুষেরই সেবায় নিয়োজিত করে মানুষেরই অধীন করে দিয়েছেন। তাঁরই কৃপাবলে মানুষ আজ বিশাল ধরিত্রীর ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে চলছে। মানুষ তার জ্ঞান ও বুদ্ধির বলে আল্লাহ্ তাআলা প্রদত্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজেদের আয়ত্তে এনে নব নব আবিষ্কার করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। আকাশ-পাতাল, সাগর, মরুভূমি, সব স্থানেই তার কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ দূরকে করেছে নিকট। ঘরের নিভৃত এক কোনে বসে নিমিষে বিশ্বের খবর নিচ্ছে। অসম্ভবকে করেছে সম্ভব। নিস্ফলা মরুকে করে তুলেছে শস্য-শ্যামলা উর্বর ভূমি। অগ্নি-জল, আলো-হাওয়া সবই আজ মানুষের করায়ত্তে। মানুষ এখন পৃথিবী ছেড়ে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রে পাড়ি দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে জাগতিক ভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ আজ উন্নতির চরম শিখরে উপনীত। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানে এতো উন্নতি করা সত্ত্বেও ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক দিয়ে মনে হয় যেন আজও তারা অজ্ঞান, অবুঝ শিশুর মত। এক্ষেত্রে যেন তারা কিছুই বুঝে না, কিছুই জানে না বা বুঝতেও চায় না।

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিরোধী শিরক, বিদআ'ত ও কুসংস্কারে মত্ত। দৃষ্টান্ত স্থলে, যেমন ইহুদীগণ বিশ্বাস করে যে, ইলিয়াস (আ.) আকাশে আছেন। তিনি আবার আসমান থেকে নেমে এসে যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা রক্তপাত ঘটিয়ে শক্তিবল দ্বারা তাদেরকে বিজয়ী করবেন। খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস যীশু (ঈসা আ.) ঈশ্বরের একমাত্র জাতপুত্র।। ক্রুশে রক্ত দিয়ে আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে স্বর্গে নীত হয়ে ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন। আবার তিনি আসমান থেকে নেমে এসে জগত জয় করবেন। মুসলমানগণের, বিশেষ করে নায়েবে রসুলের দাবীদার আলেম ওলেমা মুফ্‌তীগণের বিশ্বাস পরস্পর বিরোধী, একদিকে তারা বলে যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী নাই। তিনি মরে গিয়ে মদীনার মাটিতে শুয়ে আছেন। অপরদিকে তারা বলে, খ্রিষ্টানদের নবী ঈসা (আ.) মরেন নাই। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে স্বশরীরে আসমানে তাঁর নিকটে তুলে নিয়েছেন। আবার তিনি আসমান থেকে নেমে এসে ঢাল-তলোয়ার দ্বারা কাফেরদেরকে নিধন করবেন। রক্তপাত ঘটিয়ে শক্তিবল প্রয়োগে দাজ্জালের কবল থেকে মুসলমান জাতীকে উদ্ধার করবেন। এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে–হিংসা, বিদ্বেষ, দলাদলি, রেষা-রেষি, মারামারি, খুনাখুনিতে তারা লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

ইসলামে–আল্লাহ্ এক, রসূল এক, সরল ও সঠিক পথ একটি ভিন্ন দুটি নয়। এমতাবস্থায় শিয়া, সুন্নী, চিশ্‌তীয়া, কাদেরীয়া, নকশেবন্দীয়া,ওয়াহাবী, আহলে হাদীস, দেওবন্দী, বেরলভী, মুতাজিলা ইত্যাদি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন দল ও উপদলে নানান মত ও পথে বিভক্ত হয়ে এক দল আরেক দলের সাথে হিংসা বিদ্বেষ ঝগড়া-কলহ্ মারামারিতে মত্ত। প্রত্যেক দলের শীর্ষ ভাগে রয়েছে বড় বড় ডিগ্রীধারী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হওয়ার দাবীদার একেক জন আলেম। এর পরেও রয়েছে অগণিত পীর মুর্শিদ। যাদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। তারা ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে মহা পুণ্যের নামে দু'জাহানের অশেষ নেকী হাসিলের বাহানায় সমাজের বুকে নব নব বিধানের প্রবর্তন করে চলছে, যে গুলিকে নতুন একটা শরিয়ত বলা যায়। দৃষ্টান্ত স্থলে যেমন মিলাদ একটি। *"যা কি'না খোলাফায়ে রশেদীনের যুগে ছিল না। তাবেয়ীনদের যুগে ছিল না, তাবে তাবেয়ীনদের যুগেও 'মিলাদের' নামগন্ধ ছিল না। এই তিনযুগের পর ইসলামের নতুন যা কিছু উদ্ভাবন করা হবে তা সবই ভ্রান্ত বিদআ'ত। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, হুযূর (সা.) এর ইন্তেকালের ছয়শত বছর পরে কিছু অর্থ ও পদলোভী নামধারী আলেম দ্বারা প্রচলিত মিলাদের গোড়াপত্তন হয়। এরপর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এক শ্রেণীর লোক এই মিলাদকে শরীয়তের একটি করণীয় আচার অনুষ্ঠান রূপে পালন করছে। শরীয়তে যার কোন ভিত্তি পাওয়া যায়*

বর্তমানে চতুর্দশ শতাব্দী পার হয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর ত্রিশ বছর চলছে। প্রশ্ন এই চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ কে? এবং তিনি কোথায়? চতুর্দশ শতাব্দীতে এসে হযরত রসূল করীম (সা.) এর পবিত্র বাণী কী (নাউযুবিল্লাহ্) অকেজো হয়ে গেল? আসমান জমিন উলট পালট হয়ে যেতে পারে কিন্তু রসূল করীম (সা.) এর পবিত্র বাণী কখনো অকেজো হয়ে যেতে পারে না।

না। বরং যা মনগড়া একটি নতুন পদ্ধতি আর একথাও অনস্বীকার্য যে যার ভিত্তি শরীয়তে নেই তাকে সওয়াবের কাজ মনে করাটা বিদআ'ত ও নাজায়েজ"। (মাসিক মদীনা জুলাই ২০০৭,পৃঃ ৫০)

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "সর্বাপেক্ষা উত্তম শিক্ষা আল্লাহ্‌র কুরআন এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম আদর্শ মুহাম্মদ। নব নব বিধান প্রবর্তন অতি নিকৃষ্ট কাজ, এবং প্রত্যেক নব বিধানই বিপথে চালায়। যে কেহ আমার শিক্ষার ভিতর এমন নব বিধান প্রবর্তন করে যা আমার নয়, সে অভিশপ্ত।"

পীর পূজা, কবর পূজা, জ্বীন ভুত তাড়ানো, আর জ্বীন সম্পর্কে আলেম ওলেমাগণের বিশ্বাস এই যে, 'জ্বীন' যাদেরকে চোখে দেখা যায় না, সুযোগমত তারা মানুষের ঘাড়ে বিশেষ করে মেয়ে মানুষের ঘাড়ে ভর করে। জ্বীন তাড়ানো ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মোল্লা মৌলভীগণ রাখে। এই অজুহাতে তারা জ্বীন তাড়ানোর নামে ঝাড় ফুঁক দেয়া, তাবিজ-কবজ, তেল পড়া, পানি পড়া, নুনপড়া ইত্যাদি দিয়ে সহজে অর্থ উপার্জনের এক পন্থা অবলম্বন করছে। আসলে কুরআন-হাদীস এবং জীব বিজ্ঞানীদের মতে 'জ্বীন' বলতে অদৃশ্য কোন প্রাণী নেই। কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানুষের মধ্যেই দুইটি শ্রেণীকে জ্বীন ও ইনসান বলা যায়। যেমন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও উঁচু পদপমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে জ্বীন এবং সাধারণ মানুষকে ইনসান বলা হয়। অতএব জ্বীন বলতে আলাদা কিম্ভূত-দর্শন কোন কিছু নেই। যদি থেকেও থাকে তাহলেও মানুষের কোন ক্ষতি সাধন করার ক্ষমতা তারা রাখে না। কেননা মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত, স্রষ্টার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তাই জ্বীনও মানুষের অধীন। তারা কখনো মানুষের অজেয় কোন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে না। সমস্যার সৃষ্টি করে তারাই, যারা বিশ্বাস করে যে, জ্বীন বলে অদৃশ্য ও আলাদা একটি জাতি আছে। আমরা দেখতে পাই, জ্বীন শুধু মুসলমানের ঘাড়েই ভর করে। ইউরোপ আমেরিকার ইহুদী খ্রিষ্টানদের ঘাড়ে ভর করে না। কেননা তারা যে বেঈমান কাফের। বিজ্ঞানীদের মতে মানুষ ব্যতীত অদৃশ্যভাবে জ্বীন বলে আলাদা কোন প্রজাতি নেই। জ্বীন বলতে মানবদেহেরই একটি অস্তিত্ব। বংশগতির বৈশিষ্ট্যের একককে বলা হয় জ্বীন। মানব বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে এই জ্বীন।

সে যা হোক, সংস্কারকের আবশ্যকতার গুরুত্ব মৌলভী মৌলানাগণ তাদের বই পুস্তকে স্বীকার করেন, যেমন, *"হযরত রসূল করীম (সা.) আখেরী নবী হওয়া সত্ত্বেও সংস্কারকের দ্বার আবশ্যকবোধে বন্ধ করেন নাই। কেননা তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্‌ এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে এক এক জন মোজাদ্দেদ প্রেরণ করবেন, তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্ম সংস্কার সাধন করবেন"। ইসলাম সৌধের ওপর শতাব্দীকালের রথচক্রে যে সকল আবর্জনা রাশি পতিত হয়ে থাকে এবং তা দুনিয়া আলোকিত করবার জন্য নবরূপ অমল ধবল শুভ্র প্রস্তর খন্ডের যে জ্যোতিকে আবদ্ধ করে রাখে, তা দূরীভূত করে ইসলামের জ্যোতি পুণরায় ধরাকে প্লাবিত করে পূণর্বিজয় আনা, এটাই প্রত্যেক মোজাদ্দেদ বা ধর্ম সংস্কারকের কর্তব্য। আর ধর্মে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা বিরোধী সকল ভুল-ভ্রান্তি ও কুসংস্কার জড়িত রীতি নীতি দূরীভূত করা মুজাদ্দেদের কর্তব্য। উপরন্তু তিনি ধর্মের বিশাল জ্যোতিকে বিচ্ছুরিত করে জগদ্বাসীকে সত্য ধর্মের দিকে আকর্ষণ করবেন"।* (আলহাজ্জ মাওলানা ফজলুল করীম এম, এ,বি, এল রচিত 'মানব ধর্ম' ৮৪ পৃষ্ঠা)।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে "যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মেনে মৃত্যু বরণ করবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের" (মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, সহী মুসলিম)

পরিতাপের বিষয় যে, মৌলভী মওলানাগণ তাদের বই পুস্তকে যুগ ইমামের আবশ্যকতা স্বীকার করেন বটে। কিন্তু তাঁকে মানার সৌভাগ্য তাদের হয় না এবং এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাদ্রাসায় শিক্ষা দান করা হয় না।

বাহ্যিক জগতে দেখা যায় যে, প্রত্যেক কাজ, প্রতিটি দল এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন নেতা থাকেন। নেতা ব্যতীত একতা, শৃংখলা বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে কোন কাজ চলতে পারে না। ইসলাম বিশ্বজনীন শান্তি নিরাপত্তা ও প্রচারমূলক ধর্ম। ইসলামের অনুসারী মুসলমান জাতির জন্য একজন নেতার আবশ্যকতা নাই কি? ইসলামের বিধানানুসারে পৃথিবীতে মু'মিন মুসলমানগণের 'খিলাফত' থাকবে। 'খিলাফত' মুসলমানজাতির প্রাণশিরা। খিলাফত ব্যতীত মুসলমান জাতি প্রাণহীন মর-দেহ তুল্য। বড়ই দু:খের সাথে বলতে হচ্ছে, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি আলেম-ওলামা, মুফ্‌তি-মওলানা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামিক চিন্তাবিদ দাবিদারগণের কোন নজর নেই। এ বিষয়ে তারা ঘুমের ঘোরে অচেতন অবস্থায় বেখেয়াল বেখবর। আর এ কারণেই মুসলিম জাতির চরম অধ:পতন।

একথা সম্ভবত আলেম, ওলেমা মুফতী মওলানা সকল স্তরের কারও অজানা নেই যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ছিলেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহ.)। বর্তমানে চতুর্দশ শতাব্দী পার হয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর ত্রিশ বছর চলছে। প্রশ্ন এই চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ কে? এবং তিনি কোথায়? চতুর্দশ শতাব্দীতে এসে হযরত রসূল করীম (সা.) এর পবিত্র বাণী কী (নাউযুবিল্লাহ্‌) অকেজো

হয়ে গেল? আসমান জমিন উলট পালট হয়ে যেতে পারে কিন্তু রসূল করীম (সা.) এর পবিত্র বাণী কখনো অকেজো হয়ে যেতে পারে না। ওলী আল্লাহ্ ও বুযুর্গানে দ্বীনের মতে চতুর্দশ শতাব্দীর যিনি মুজাদ্দেদ তিনিই আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)। আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুত এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সঠিক সময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ এবং আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ এর দাবী করেছেন। তাঁর দাবীর সমর্থনে একদিকে কুরআন হাদীস এবং অপরদিকে অসংখ্য জ্বলন্ত ঐশী নিদর্শন দ্বারা তাঁর সত্যতা প্রমাণিত ।

ঐশীবাণী প্রাপ্ত হয়ে তিনি ইহুদী জাতির কাল্পনিক বিশ্বাস ইলিয়াস নবী আসমানে আছেন আবার তিনি আসমান থেকে নেমে আসবেন, খ্রিষ্টান জাতির সমস্ত কল্পিত খোদা যীশু (ঈসা আ.) আসমানে আছেন আবার তিনি আসমান থেকে নেমে আসবেন, মুসলমানগণের নায়েবে রসূলের দাবীদার আলেম ওলেমা মুফতি মওলানাগণের অন্ধ বিশ্বাস হযরত ঈসা (আ.) আসমানে আছেন আবার তিনি আসমান থেকে নেমে আসবেন ইত্যাদি ইহুদী খ্রিষ্টান ও মুসলমান জাতির ভ্রান্ত ও কাল্পনিক বিশ্বাস-এর অপনোদন করেন। এটা আসলে ক্রুশীয় মতবাদ। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আগমন করবেন এবং ক্রুশ ভঙ্গ করবেন। ক্রুশ বলতে তামা, কাসা, পিতল, লোহা বা কাঠ নির্মিত ক্রুশ নয়, ক্রুশীয় মতবাদ বুঝানো হয়েছে। হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)ও কাল্পনিক এ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করবেন অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করে, কাশ্মীরে তাঁর কবর দেখিয়ে ক্রুশীয় মতবাদকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে মাটির ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই সকল ভ্রান্ত অলীক, ভুল ভ্রান্তি ও কুসংস্কার জড়িত রীতি নীতি যা ধর্ম নীতি বলে আখ্যাত হয়েছে তা দূরীভূত করে সংস্কার সাধন করাই হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর কাজ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যবৃন্দ নিজেদের ধন সম্পদ এবং জীবন যোগে বিশ্বের বুক থেকে যাবতীয় শিরক, বিদআ'ত মিটিয়ে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এর আদর্শ শিক্ষাকে জগৎব্যাপী প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে অসত্যের সাথে দিবানিশি জিহাদে লিপ্ত।

ইসলাম যেমন আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত ধর্ম। তেমনি ইসলামের রক্ষাকর্তাও স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা। (আল হিজর)। আল্লাহ্ তাআলা কোন আলেম, ফাজেল, মুফতি-মওলানা, পীর-মুর্শিদ দ্বারা ইসলামকে রক্ষা করার কথা বলেন নি। তিনি ইসলামকে রক্ষা করেন তাঁর মনোনীত প্রেরিত মহাপুরুষের মাধ্যমে। "তিনি যা করেন সে বিষয়ে কারও প্রশ্ন করার অধিকার নেই। কিন্তু তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।" (সূরা আম্বিয়া)

দয়াময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সঠিক সময়ে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে দল ও উপদলে শতধা বিভক্ত মুসলমান জাতির মধ্যে পুণরায় 'খিলাফত' প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামের বিশ্ববিজয় ও মুসলমান জাতির উন্নতির পথ খুলে দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত না মুসলমান জাতি আল্লাহ্ তাআলার প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের ছায়াতলে সমবেত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাদের ললাটে ভাগ্য পরিবর্তনের দ্বিতীয় আর কোন পথ খোলা নেই।

অতএব, আল্লাহ্ তাআলার সমীপে আমাদের বিনীত দোয়া মুসলিম উম্মাহ দ্রুত তা অনুধাবন করে সমাগত এ সত্যের সাথে নিজেদের শামিল করে নিন। সেই সাথে ইসলামের পূণর্বিজয়ের এ যুগে আহমদীয়া খিলাফতের সর্বজনীন ঐক্যের সাথে সমগ্র মানবজাতির সংবদ্ধ হওয়ার তৌফিক লাভ হোক।

কুরআন শরীফের ব্যাখ্যার অবশিষ্টাংশ

(পৃ: ২ এর ধারাবাহিকতায়)

(২) কুরবানীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষ, আমাদের সর্ব প্রকার ধারণা কল্পিত আদর্শ এমনকি প্রাণ ও সম্মান আল্লাহ্ তাআলার জন্য ত্যাগ করে তাঁর তৌহীদ অর্থাৎ একত্ব উপলব্ধি করা এবং ঘোষণা করা। ইসলাম ধর্মে কুরবানীর ধারণা, ক্রুদ্ধ দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করা নয়, অথবা কারও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাও নয়, বরং আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যক্তির সমস্ত কিছুর কুরবানী করা। ১৯৫৪। কুরবানীর জন্য মক্কায় উটগুলিকে জবাই করা এমন এক প্রতীক-স্বরূপ যে, মানুষ তার স্রষ্টা এবং প্রভুর পথে জীবন দিতে প্রস্তুত, যেমন করে উটগুলো তাদের নিজ মালিকের জন্য প্রাণ দেয়। এটাই হল কুরবানীর চরম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। আয়াতে উল্লেখিত অপর উদ্দেশ্যসমূহ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। যখন সে একটি পশুকে কুরবানী করে, তখন হজ্জযাত্রীকে স্মরণ করে দেয় যে, এটা আল্লাহ্‌র এক নিদর্শনস্বরূপ। এই আয়াত আরও প্রমাণ করে যে, কুরবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত সঠিকভাবে বন্টন করা উচিত যেন অপচয় না হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলাম
প্রচার-প্রসার ও বিস্তারে আহমদীয়াত

মোহাম্মদ এহ্‌সানুল হাবিব
মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন

(২য় কিস্তি)

সুইজারল্যান্ড :

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর আহ্বানে মোকাররম শেখ নাসের আহমদ সাহেব, চৌধুরী আব্দুল লতিফ সাহেব এবং মৌলভী গোলাম আহমদ বশির সাহেব, ১৩ অক্টোবর ১৯৪৪ সুইজারল্যান্ডের জুরীখে পৌছান। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ৯ মে থেকে ১০ জুন ১৯৫৫ পর্যন্ত জুরীখে অবস্থান করে সেখানকার আহমদীয়া মিশন পরিদর্শন করে স্বীয় পবিত্র হস্তে লিখেন "আল্লাহ্ তাআলা সুইজারল্যান্ডের অধিবাসীদেরকে তাঁর মনোনীত ধর্মের পথপ্রদর্শন করুন এবং তাদের সাথী হউন।" (আল ফযল ৭ জুন ১৯৫৫ ১ম পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

১৯৬২ সালে ২৫ আগষ্ট তারিখে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কন্যা হযরত সৈয়্যদা আমাতুল হাফিজ বেগম সাহেবা (রা.) স্বীয় পবিত্র হস্তে সুইজারল্যান্ডের ১ম মসজিদ **(মসজিদে মাহমুদ)** এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে সুইজারল্যান্ড সফর করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে ১৪ জুন ১৯৮৭ সালে ইউনিভার্সিটি অব সুইজারল্যান্ড 'ঐশীবাণী' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। মিলনায়তন দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল। ইতিহাসে শুধুমাত্র দুইবার এই স্থানে এত লোক সমাগম হয়েছিল। ১ম বার চার্চিল সেখানে এসে বক্তব্য রেখেছিলেন, ২য় বার হুযূর (রাহে.) বক্তব্য রাখেন (মাসিক খালেদ, সৈয়্যদনা তাহের সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা নং ২২২)

স্কেন্ডেনেভিয়া :

১৯৩২ সালে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) স্বপ্নে দেখেন, নরওয়ে সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং হাঙ্গেরীর লোকেরা আহমদীয়াতের অপেক্ষায় আছে এই স্বপ্নের একটি দিক ১৯৫৫ সালের ১৪ জুন তারিখে সুইডেনের গোটেনবার্গে মোকাররম কামাল ইউসুফ সাহেবের তবলীগের ফলে ১৭ আগষ্ট মি. এরিরাসন আহমদীয়াত কবুল করার মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পায়।

তার ইসলামী নাম সাইফুল ইসলাম মাহমুদ রাখা হয়। এরপরে তাঁকে সুইডেনের অনারারী মোবাল্লেগ নিযুক্ত করা হয়। এরপর কামাল ইউসুফ সাহেব কিছু দিন গোটেবার্গে স্টোকহোমে অবস্থান করে ১৯৫৮ সালের ২৮ আগষ্ট অসলোতে মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

একই ভাবে তিনি **ডেনমার্কেও** তবলীগি কার্যক্রম জারি রাখেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর অনুমতিক্রমে ১৯৬০ সালে ডেনমার্কের ১ম আহমদী মোকাররম আব্দুস সালাম মেডিসন ডেনিস ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ করা শুরু করেন। ১৯৬৭ সালে ১ম বারের মত ডেনিস ভাষায় কুরআন মজীদ প্রকাশিত হয়। কোপেনহেগেনে আহমদী মহিলাদের চাঁদায় মসজিদ নির্মিত হয়। ১৯৬৭ সনের ১২ জুলাই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) স্কেন্ডেনেভিয়ার এই ১ম মসজিদ **"মসজিদে নুসরাত জাঁহা"** এর উদ্বোধনে বলেন, "মসজিদ খোদার ঘর এটি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ইসলামী মসজিদের দ্বার এক খোদার ইবাদতকারী সমস্ত ব্যক্তি এবং ধর্মীয় গোত্রের জন্য উন্মুখ"। (আল ফযল, ১১ আগষ্ট, ১৯৬৭ ৩য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৮০ সালের ১লা আগষ্ট নরওয়ের পবিত্রতম মসজিদ **"মসজিদে নূর"** অসলোতে জুমুআর নামায আদায়ের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন।

হুযূর (রাহে.) ১৯৮০ সালের ২৩ জুলাই গোটেনবার্গে একটি সাক্ষাৎকার প্রদানকালে বলেন, "......আমি বিশ্বাস রাখি, ভালবাসা, সম্প্রীতি এবং নি:স্বার্থ সেবার মাধ্যমে একদিন আমরা ইসলামের স্বপক্ষে তোমাদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হব। যেদিন আমরা তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারব, আমরা তোমাদের কাছে যা উপস্থাপন করছি, তা তোমাদের কাছে যা আছে তার চেয়ে উত্তম–তখন তোমরা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারবে না"। (দৌড়ায়ে মাগরিব, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

১৯৯৩ সালের ২৫ জুনে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) 'নর্ড কেপ' সফরকালে খুৎবায় বলেন, এই স্থানকে পৃথিবীর সর্বশেষ প্রান্ত বলা হয়। এভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপর এলহাম "আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌছাবো"–পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে।

ইতালি :

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) 'ওয়েম্বলী কনফারেন্স' যোগদান উপলক্ষে ১৯২৪ সালে লন্ডনে গমন করেন। সে সময়ে ১৬-২৪ আগষ্ট তিনি (রা.) ইতালি ভ্রমণ করেন। ভ্রমণকালে তিনি প্রধান মন্ত্রী মুসোলিনির সাথে সাক্ষাৎ করেন।

মি. মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল এবং মৌলভী মোহাম্মদ ওসমান সাহেব ১৯৪৬ সালের ১৪ এপ্রিল লন্ডন থেকে ইতালিতে রওয়ানা হন।

তারা মেসিনা (সিসিলি)-কে কেন্দ্র বানিয়ে ইসলামের প্রচার করেন এবং কিছু লোক আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তবলিগী কার্যক্রমের প্রাথমিক কালেই সিসিলের ক্যাথলিক সরকার সেদেশে তাদের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে অসম্মতি জানায়।

১৯৪৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে তাদেরকে সেদেশ ছাড়তে হয়। কিন্তু এই স্বল্প সময়ে খোদার অনুগ্রহে ঐ স্থানে ইসলামের বীজ রোপিত হয়ে যায়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, এটি আল্লাহ্ তাআলার কতই না অনুগ্রহ তিনি ইসলামের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে আমাদের জামা'তকে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন।

আর আমাদের যুবকদের মাঝে আন্তরিকতা ও ত্যাগের স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন। আজ আমরা স্পেন এবং সিসিলিতে পুণরায় আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে ইসলামের পতাকা উড়ানোয় রত আলহামদুলিল্লাহ্। (আল ফযল ৪ জুলাই, ১৯৪৬, ৩য় পৃ: ২য় কলাম)

ফ্রান্স-বেলজিয়াম :

ওয়েম্বলী কনফারেন্স লন্ডনে অংশগ্রহণের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ২৬-৩১ অক্টোবর ১৯২৪ পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থানকালে আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে সেখানে ইসলাম প্রচারের কার্যক্রম শুরু হয়।

২৯ আগষ্ট হুযূর (রা.) প্যারিস সরকারের পক্ষ থেকে নির্মিতব্য মসজিদ পরিদর্শন কালে মেহেরাবে দাঁড়িয়ে জামা'তের সদস্যদের সাথে দীর্ঘ সময় দোয়া করে বলেন, আমি তো এখানে এই দোয়া করেছি, "হে আল্লাহ্! আমরা যেন এই মসজিদ পাই, আর একে তোমার ধর্ম প্রচারের কাজে লাগাতে পারি"।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর নির্দেশে ফ্রান্সে নিয়মিত তবলীগী মিশন খোলার জন্য মোকররম মালেক আতাউর রহমান সাহেব ১৯৪৬ সালের ১৭ মে প্যারিসে পৌছান। ফ্রান্সে তবলীগি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারী অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল যা অতি সহজেই ২২ জুন ১৯৪৮ সালে পাওয়া যায়। ১৯৪৯ সালের ২৩ মে **Madam Magaerite Demagani** নামে ফ্রান্সের এক শিক্ষিত মহিলা আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাঁর ইসলামী নাম 'আয়েশা' রাখেন। এই ভদ্র মহিলা ফরাসি ভাষায় অনুবাদে অবদান রাখেন। মোহতরম মালিক আতাউর রহমান সাহেব ফ্রান্সের প্রতিবেশী দেশ বেলজিয়ামের প্রতিও মনোনিবেশ করেন।

১৯৪৮ সালের ২৬ নভেম্বর তিনি সেদেশের রাজধানী ব্রাসেলস গমন করেন। ১৯৮২ সালের ১৬ জুলাই এখানে মিশন স্থাপিত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৩ অক্টোবর ১৯৮৫ সালে ১ম মিশন হাউজ উদ্বোধন করেন।

হল্যান্ড :

হল্যান্ডে আহমদীয়াত অর্থাৎ ইসলামের বাণী মওলানা আব্দুর রহীম দারদ্ মোবাল্লেগ ইংল্যান্ডের মাধ্যমে পৌছে। যিনি ১৯২৬ সালে বেলজিয়াম যান এবং পরে হল্যান্ডে গমন করে সেখানকার বিভিন্ন জায়গায় সুধী সমাজে বক্তব্য প্রদান করেন। ইংল্যান্ড থেকে মওলানা দারদ সাহেবের ফিরে আসার পর মওলানা জালাল উদ্দিন শামস সাহেবকে সেখানে পাঠানো হয়। হল্যান্ডে মওলানা জালাল উদ্দিন সাহেবের অবস্থানকালীন সময়কে সেখানের আহমদীয়াতের ইতিহাসে স্বর্ণ যুগ হিসেবে বিবেচিত হয়। তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ডাচ ভাষায় কুরআন মজীদের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। যার সমস্ত ব্যয়ভার এক ওলন্দাজ ভদ্র মহিলা **মিসেস জিমারম্যান** বহন করেন। যিনি ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর ইসলামী নাম "নাসিরা"। ১৯৪৭ সালে ২ জুলাই হাফেজ কুদরত উল্লাহ্ সাহেব হল্যান্ডে স্থায়ী আহমদীয়া মিশন হাউজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

১৯৫০ সনে হল্যান্ডের হেগ নগরীতে একটি সুরম্য **"মসজিদ মোবারক"** নির্মিত হয়। লন্ডনের মসজিদ ফজলের মত এই মসজিদটিও আহমদী মহিলাদের চাঁদায় নির্মিত হয়। চৌধুরী হযরত জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.) ১৯৫৫ সনের ২০ মে স্বীয় পবিত্র হস্তে এই মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে একটি বাণী পাঠান। যাতে তিনি বলেন, "*আমরা নব উদ্যমে ইসলামের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছি। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নায়েব হওয়া কোন সাধারণ পদবী নয়। আজ জগত এর মহত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ। একদিন আসবে যখন সারা দুনিয়ার বাদশাহগণ ঈর্ষার দৃষ্টিতে এই সেবার কথা স্মরণ করবে।*" (আল ফযল, ২৩ জুন ১৯৫৫, ৩য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাঁর ঐতিহাসিক বিশ্ব ভ্রমণের এক পর্যায়ে আফ্রিকা থেকে ফেরার পথে ১৯৭০ সালে ১৪ মে হল্যান্ড গমন করেন।

আমেরিকা :

এই নব বিশ্ব ভূমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে ঈর্ষাপরায়ণ এবং প্রভাবশালী খৃষ্টান **ডা. জন আলেকজান্ডার ডুই ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর বিরোধিতায়** আপাদমস্তক নিমজ্জিত ছিল সে। একথা পর্যন্ত সে বলেছে, "আমি অনতিবিলম্বে ইসলামের নিপাক হোক এজন্য দোয়া করি। হে খোদা! তুমি এমনই কর। হে খোদা! ইসলামকে ধ্বংস কর"।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলামের এই শত্রুকে মুবাহেলার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন যা আমেরিকার বিখ্যাত পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এই মুবাহেলার বর্ণনায় তিনি (আ.) বলেন, আমার মুবাহেলার বিষয় বস্তুই ছিল ইসলাম সত্য এবং খৃষ্টীয় মতবাদ ভ্রান্ত। আর আমিই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ শেষ যুগে যার আগমনের কথা রয়েছে.......ডা: ডুই এর নবুওয়াতের দাবী এবং ত্রিত্ববাদ উভয়ই মিথ্যা। যদি সে আমার সাথে মুবাহেলায় অগ্রসর হয় তাহলে সে দু:খ ও হতাশার সাথে মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি

সে মুবাহেলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ নাও করে তবুও সে খোদার শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না।" এর উত্তরে দুর্ভাগা ডুই ১৯০৩ সনের ডিসেম্বরে ইংরেজীতে ধৃষ্টতাপূর্ণ এক প্রবন্ধ লিখে। যার অনুবাদ হলো–*ভারতবর্ষে এক নির্বোধ মুহাম্মদী মসীহ্ আমাকে বার বার লিখে যে, ঈসু মসীহ্-এর কবর কাশ্মীরে বিদ্যমান আর লোকেরা আমাকে বলে.........তুমি কেন এ ব্যক্তির কথার উত্তর দাও না? তোমরা কি ভেবেছ আমি মশামাছির কথার উত্তর দিব? যদি এর উপর আমি আমার পা রাখি আমি চাইলে তাকে পায়ের নীচে পিষে ফেলতে পারি।* ......এই ব্যক্তি, ইউরোপ আমেরিকা এবং প্রায় সারা দেশে প্রকাশিত মোবাহেলা সংক্রান্ত ঘোষণার পরও ক্রমাগতভাবে তার দম্ভ প্রদর্শন করতেই থাকে। ......খোদা তাআলা আমাকে জানিয়েছেন, **"তুমি বিজয়ী হবে এবং শত্রুকে ধ্বংস করা হবে।"** ইসলামের এই শত্রু হযরত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.)-এর দাস হুযূর (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৯০৭ সালের ৯ মার্চে অপমান অপদস্থ হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "আমি যুগ ইমাম। যে ব্যক্তি আমার প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণভাবে দন্ডায়মান হবে তাকে অপমান, অপদস্থ করা হবে। আমার প্রতি অর্পিত বাণী আমি পৌঁছে দিয়েছি।"

১৯৬৭ সালের ৯ মার্চ ডাঃ জন আলেকজান্ডার ডুই এর মৃত্যুতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এখন ডুই এর মৃত্যুর নিদর্শন (যা মহান বিজয়ের ইঙ্গিতবহ) সমস্ত পৃথিবী এশিয়া, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের জন্য একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। **কেননা এতদিন আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নিদর্শনাবলী শুধুমাত্র পাঞ্জাব বা ভারতবর্ষের লোকের জন্য সতর্কবাণীরূপে সীমাবদ্ধ ছিল। আর ইউরোপ আমেরিকার কোন কোন ব্যক্তি এ বিষয়গুলো জানত না। কিন্তু এই নিদর্শনটি পাঞ্জাব থেকে ভবিষ্যদ্বাণী আকারে প্রকাশিত হয়ে আমেরিকায় এমন এক ব্যক্তির ওপর পূর্ণ হয়েছে যাকে ইউরোপ আমেরিকার প্রত্যেক লোক চেনে। তার মৃত্যুর সাথে সাথেই টেলিগ্রামের মাধ্যমে সে দেশের ইংরেজী পত্র পত্রিকায় খবর দেয়া হয়।** (হাকীকাতুল ওহী, ৫০৫-৫১১ পৃষ্ঠা)

আমেরিকার জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েব হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন যা হুযূর (আ.) তাঁর *শাহানায়ে হক* পুস্তিকায় সংরক্ষণ করে রাখেন। হুযূর (আ.) ১৮৮৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখে তাকে পুস্তকাদি প্রেরণ করেন আর নিয়মিত পত্র যোগাযোগ চলতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে মি. ওয়েব মুসলমান হয়ে যায়। আর এভাবেই আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম বারের মত ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কার্যক্রম শুরু হয়। তার মাধ্যমেই আমেরিকার মি. ওয়া ওয়ারসন হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেবের সাথে পত্র যোগাযোগ করে ১৯০৪ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে ইসলামে প্রবেশ করেন। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর ইসলামী নাম 'আহমদ' রাখেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেবকে ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা যাবার নির্দেশ দেন। ১৯২০ সালের ২৬ জানুয়ারী তিনি ইংল্যান্ড থেকে রওয়ানা হয়ে ১৯২০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া বন্দরে অবতরন করেন।

ইমিগ্রেশন দপ্তর থেকে তাঁকে সেদেশে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া হয়। তিনি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন মুফতি সাহেবের নজরবন্দীর বিষয়টি জানতে পারেন, তখন তিনি একটি বক্তৃতায় বলেন, **"আমেরিকা–যারা নিজেদেরকে অনেক শক্তিশালী ভাবে এখন পর্যন্ত তারা শুধু মাত্র দুনিয়াবী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছে। তারা আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। তারা যদি আমাদের সাথে বিরোধিতা করার চেষ্টা করে তাহলে তারা শীঘ্রই বুঝতে পারবে আমাদেরকে কোন ভাবেই পরাস্ত করা সম্ভব নয়। কেননা খোদা আমাদের সাথে আছেন"।**

[তাহরীকে জাদীদের খিলাফত শতবার্ষিকী স্মরনিকা অবলম্বনে]

তাহরীকে জাদীদের কল্যাণমন্ডিত কর্মসূচীতে অংশ নিন

তাহরীকে জাদীদের অর্থ বছর শুরু হয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সমস্ত আমীর, মুরব্বী, মোয়াল্লেম, ইনচার্জ এবং প্রেসিডেন্ট সাহেবগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে 'তাহরীকে জাদীদ'-এর প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করুন।

* জামা'তের যেসব সদস্য এখনও এই আশিসপূর্ণ তাহরীকে অন্তর্ভূক্ত হননি, তাদেরকে অন্তর্ভূক্ত করতে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন।

* নব বয়আতকারীগণকেও এই রূহানী আন্দোলনে সাথী করে নিন, এতে তারা নগণ্য পরিমাণ আর্থিক কুরবানী যা-ই করুন না কেন।

* ৩১ অক্টোবর' ১০ এর মধ্যে ওয়াদা অনুযায়ী শতভাগ আদায় নিশ্চিত করতে জোরদার প্রচেষ্টা নিন।

* 'দপ্তর আওয়াল'-এ অংশগ্রহণকারী মরহুম সদস্যগণের যে রেকর্ড-খাতা চালু করা হয়েছে সে সম্পর্কে নির্দেশনা হলো–স্থানীয় পর্যায়ে সেই রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করুন।

সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তা সুসম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করুন যে, এটি সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়েছে।

জাযাকুমুল্লাহ্! আহসানুল জাযা
নিবেদক–
শহীদুল ইসলাম বাবুল
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, তাহরীকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

পাকিস্তানে আরেকজন আহমদী মুসলমানের শাহাদতের ঘটনা
‘এ পরীক্ষা ধৈর্যের সাথে পাড়ি দিন’
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের প্রাণপ্রিয় নেতার বার্তা

৫ অক্টোবর, ২০০৯ : নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের প্রাণপ্রিয় নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ প্রদত্ত সাপ্তাহিক জুমুআর খুতবায় এ দু:সংবাদটি নিশ্চিত করেন যে, পাকিস্তানে ধর্মের কারণে আরো একজন আহমদী মুসলমানকে শহীদ করা হয়েছে। অধিকন্তু পেশোয়ার শহরে অন্য দু’জন আহমদী মুসলমানও এক সন্ত্রাসী বোমা হামলার শিকার হয়েছেন।

পাকিস্তানের ‘উচ্‌শরীফ’-এর মুহাম্মদ আজিম তাহিরকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ইং তারিখে তার স্ত্রী ও কন্যার উপস্থিতিতে শহীদ করা হয়, *(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।*

জনাব তাহির পারিবারিক বিবাহোৎসব শেষে মোটরবাইক যোগে সন্ধ্যা সাড়ে আট ঘটিকায় নিজ গৃহে যখন ফিরছিলেন, সে সময় দু’জন অপরিচিত লোক আগ্নেয়াস্ত্র তাক করে তার বাহন থামাতে বাধ্য করে। বিভ্রান্ত অবস্থায় জনাব তাহির মোটর বাইক-এর ব্রেক কষলে তার স্ত্রী ও কন্যা মোটর বাইক থেকে পরে যান। জনাব তাহির যখন তার পরিবারকে সাহায্য করতে এগিয়ে যান হামলাকারীরা তখন তাকে বাধা দেয় এবং তার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে রাখলে, তারা যা চায় তা সবকিছু নিয়ে নিতে এবং তাকে ও তার পরিবারকে ছেড়ে দিতে জনাব তাহির তাদেরকে অনুরোধ জানান, কিন্তু তিনি একথা বলার সাথে সাথে হামলাকারীদের একজন তার কপালের পার্শ্বদেশে গুলি করে এবং ঘটনাস্থলেই তিনি, তার স্ত্রী ও কন্যার চোখের সামনেই মারা যান। হামলাকারীরা ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়। শুধুমাত্র আহমদী মুসলমান হওয়ার কারণেই মুহাম্মদ আজিম তাহিরকে হত্যা করা হয়। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও কন্যা রেখে গেছেন।

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ইং তারিখেও রিয়াজ আহমদ (৪০), ইমতিয়াজ আহমদ (২০) নামীয় দুজন আহমদী সহোদর বাণিজ্যিক জেলা পেশোয়ারে এক বিশাল গাড়ীবোমা বিস্ফোরণের শিকার হন। এই বিস্ফোরণের ফলে উভয় ভ্রাতাই নিহত হন।

আহমদীদের এধরনের অবিরাম নৃশংসতার সম্মুখীন হবার কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, *“আমাদের জামা’তের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের জামা’তের কিছু সদস্যকে হত্যা করতে পারে, তারা আহমদীদের সম্পদ অপহরণ করতে পারে, তারা আমাদের ইমারতসমূহ ধ্বংস করতে পারে; তারা আমাদের মসজিদ সমূহ নির্মাণের কাজে বাধা দিতে পারে। কিন্তু তারা কখনো আমাদের ঈমানকে দুর্বল করতে পারে না”।*

হুযূর আকদাস (আই.) জামা’তের সদস্যদেরকে এসব নির্যাতন সবুরের সাথে সইতে উপদেশ দেন, যেভাবে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হচ্ছে, “অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন যারা সহিষ্ণুতার সাথে অধ্যবসায়ী হয়”। তিনি বলেন, আহমদীরা যেসব কুরবানী করেছে তা কখনো বৃথা যেথে পারে না। একজন আহমদীর নিসৃত প্রতিফোঁটা রক্ত জামা’তের সাফল্যের উৎসে পরিণত হবে।

তিনি আরো বলেন যে, বর্তমানে এমনকি আহমদী শিশুদেরকেও নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে। স্কুলের শিশুদেরকেও মাঝে মাঝে এমন ভাবে বিদ্রূপ করা হয়ে থাকে যেন তারা ভয়ে তাদের লেখা-পড়া ছেড়ে দেয়; ২০০৮ সালে ফয়সালাবাদ মেডিক্যাল কলেজের আহমদী ছাত্রদেরকে বিরোধী চরমপন্থীদের তরফ থেকে দৈহিক ও মানসিক হিংস্রতার শিকার বানিয়ে সামায়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল; এবং অতি সম্প্রতি লায়াহ্ জেলায় চার জন আহমদী শিশুর বিরুদ্ধে অমুলক অভিযোগ উত্থাপন করে অমানবিক ভাবে কয়েক মাসের জন্য জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তিনি (আই.) বলেন, *“যদি এসব শিশুদের পিতা মাতারা কোন সন্ধিক্ষণে আহমদীয়াতের সত্যতা অস্বীকার করতো (নাউযুবিল্লাহ্) তখন তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সব অভিযোগ তুলে নেয়া হতো। বিরুদ্ধবাদীদের এটা একটা বৃথা আশা যে, তাদের ভয় দেখানো ও নিষ্ঠুরতার ফলে আহমদীরা তাদের ধর্ম-বিশ্বাস পরিত্যাগ করবে”।*

খুতবার উপসংহারে হুযূর (আই.) সারাবিশ্বের আহমদীদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ করে বলেন যে, এই নির্যাতন তীব্রতর হবে। তিনি (আই.) বলেন, *“বিশ্বব্যাপী জামা’তের সদস্যদের জন্য জরুরী যে তারা দোয়ায় মনোযোগ দেবে। কারণ, যে পন্থায় এ অবস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে মনে হয়, আহমদীরা বিশেষভাবে পাকিস্তানের আহমদীরা বর্ধিত নিষ্ঠুরতা ও কষ্টের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। অজ্ঞ বিরুদ্ধবাদীরা এটা অনুধাবন করে না যে তাদের এ কাজ আমাদের জামা’তের কোনই ক্ষতি করছে না বরং সার্বিক ভাবে তা দেশ ও সমাজেরই ক্ষতি করছে”।*

[প্রেস সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত ইন্টারন্যাশনাল ২২, ডিয়ার পার্ক রোড, লন্ডন, এস ডব্লিউ ১৯, ৩ টি, এল, ইউ,কে]

অনুবাদ : **মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এর বাংলাদেশ সফর

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(নবম কিস্তি)

পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম সালানা জলসা ২৪-২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ মহতী জলসায় আমীরুল মু'মিনীন আধ্যাত্মিক জগতের বিশ্ব নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর ঢাকায় আসার আশা ছিল। তাঁর চরণধূলীতে বাংলার মাটি ধন্য হওয়ার সম্ভাব্য কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। ফলে বাঙালি আহমদীদের প্রাণে আনন্দের বন্যা হয়ে যায়। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ :

১৯৬১ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদীদের মাঝে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

প্রাদেশিক সালানা জলসা

আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি মোতাবেক ১১, ১২ ও ১৩ই ফাল্গুন শুক্র, শনি ও রবিবার পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম বার্ষিক সালানা জলসা ৪ নং বকশী বাজার রোড ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে (ইনশাআল্লাহ্)। কেন্দ্র হতে জনাব মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সম্পাদক আল্ ফোরকান এবং ভুতপূর্ব মুসলিম প্রচারক মধ্যপ্রাচ্য ও প্যালেষ্টাইন, জনাব মাওলানা মোবারক আহমদ ভূতপূর্ব প্রধান মুসলিম প্রচারক পূর্ব আফ্রিকা এবং সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ও নাযেমে ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। উক্ত জলসায় বিশ্ব আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তৃতীয় খলীফা হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (আই.) সাহেবের শুভাগমনের সম্ভাবনা রয়েছে।

সকল ধর্ম পিপাসু ভাই-বন্ধুদেরকে আমাদের জলসায় যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে। এই জলসা চলাকালীন সময়ে প্রাদেশিক মজলিস-ই-শূরার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। উক্ত শূরায় কোন আলোচনাযোগ্য বিষয় থাকলে তা–

সেক্রেটারী মজলিস এ শূরা

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১

এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে (পাক্ষিক আহমদী ৩১ জানুয়ারী ১৯৬৭)।

কিন্তু বাংলার মাটি আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত খলীফার পদচারণ লাভের সৌভাগ্য হয়নি। এদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট খোদার মনোনীত ঐশী নেতাকে বরণ করার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। তখন রাজনৈতিক অঙ্গনে দুর্বার আন্দোলনের প্রবাহে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে। ফলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর আসা সম্ভব হয়নি। জলসার প্রাক্কালে হুযূর সালেস (রাহে.) ব্যতিত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.), মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী এবং মাওলানা শেখ মোবারক আহমদ সাহেবের ঢাকায় শুভাগমন হয়। আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়ে বাঙালি আহমদীদের তালিম তরবিয়ত প্রদানের মাধ্যমে তাক্ওয়াপরায়ণ আহমদী গড়ে তোলার লক্ষ্যে মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের পদধূলী পরে। উল্লেখ্য, সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব নভেম্বর ১৯৬০ থেকে অক্টোবর ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বিশ্ব মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর এবং নভেম্বর ১৯৬৬ হতে অক্টোবর ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সদর ছিলেন। সাথে নাযেম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদের দায়িত্বও তাঁর ওপর অর্পিত ছিল। তখন ঢাকার দারুত তবলীগে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত জলসা সম্মানিত অতিথিদের পদচারণে আনন্দমুখরিত হয়ে উঠে। বিভিন্ন অধিবেশনে তাদের সভাপতির আসন গ্রহণ এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভাষণ দানে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়।

জলসার শেষ দিন ২৬ ফেব্রুয়ারি সমাপনী অধিবেশনে মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের সভাপতির আসন গ্রহণ ও ভাষণ দানে সকলে আবেগাপ্লুত হয়ে যায়। তিনি হাসতীয়ে বারিতাআলা অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের উপর এক অমূল্য ভাষণ দান করেন।

এ প্রসঙ্গে জলসায় উপস্থিত শ্রোতা জনাব আব্দুল জলিল বলেন–"তখন বর্তমান দারুত তবলীগ মসজিদটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। মসজিদের ছাদ ঐ সময়ে নির্মিত হয়নি। ছাদহীন নির্মাণাধীন মসজিদের উত্তর দিকে স্টেজ তৈরী করে জলসাগাহ তৈরী হয়েছিল। তিনদিন ব্যাপী জলসার শেষ দিন সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব। সমাপনী ভাষণে তাঁর বিষয়বস্তু ছিল 'হাসতীয়ে বারিতাআলা' অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব'। তিনি এ বিষয়ের ওপর ঈমান বর্ধক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব সম্পর্কে এমন জোরালো যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দেন এতে পুরো জলসাগাহ পিতপতন নিরবতায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁর ভাষণ শোনেন। তাঁর সেদিনের ভাষণের ধ্বণী–প্রতিধ্বণী আজও যেন আমার কানে ধ্বণীত্ব হয়। তিনি আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী এমনভাবে তুলে ধরেন যেন উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর কাছে আল্লাহ্ তাআলার উপস্থিতি অনুভুত হয়। সে ভাষণের কোন তুলনা হয় না। সে বছর সাহেবযাদা মির্যা সাহেবের সাথে জামা'তের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মরকয থেকে ঢাকার জলসায় আগমন করেন। মরকযের বুযুর্গদের আগমনের সংবাদ শুনে পাশ্ববর্তী ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার উল্লেখযোগ্য ছাত্র জলসায় এসে তাদের ভাষণ শুনেন এবং তাদেরকে নোট করে নিতেও দেখা গেছে।

জনাব জলিল আরো বলেন, তিনি তেজগাঁও মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ থাকাকালে মজলিসের চাঁদা এবং কার্যক্রমের রিপোর্ট রাবওয়া পাঠাতেন। তখন হযরত মির্যা তাহের আহমদ বিশ্ব মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর। সাহেবযাদা তাহের আহমদ সাহেব চাঁদা প্রাপ্তির স্বীকার এবং রিপোর্টগুলির উত্তর বাংলায় লিখে নিজে স্বাক্ষর করে পাঠাতেন। এ ধরণের বহু পত্র তেজগাঁও মজলিসে সংরক্ষিত ছিল। দু:খের বিষয় মূল্যবান চিঠি-পত্রগুলি সঠিকভাবে হিফাযত না করার কারণে হারিয়ে গেছে। বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অতুলনীয়।

জলিল সাহেব প্রবাসের স্মৃতিচারণে বলেন, ১৯৯১ সালে যখন লন্ডনে যাই তখন এম,টি,এ এখনকার অবস্থায় ছিল না। ১৯৯১-৯৫ সাল পর্যন্ত ইউ.কে, সালানা জলসা, জার্মানীর জলসা, খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা এবং জার্মানীর প্রবাসী বাঙালিদের সম্মেলনে হুযূর (রাহে.)-এর সকল ভাষণ খাকসার এবং জনাব আব্দুর রব মিলে বাংলায় অনুবাদ করে শুনানোর ব্যবস্থা করি। এ সময়ে সেখানে হুযুরের সাথে আমার অনেকবার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। প্রতিবারই তিনি সহাস্য বদনে আমার ও বাংলাদেশীদের বিষয় জানতে চেয়েছেন এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর মহানুভবতার কথা কখনও ভুলার নয়। বাঙালিরা এক মহান খলীফার সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, এটাই আমাদের মহা সৌভাগ্য।"

জলসার অনুষ্ঠানের সাথে প্রাদেশিক জামা'তের মজলিসে শূরার অধিবেশন হয়। শূরার অনুষ্ঠানকে সার্থক ও সফল করতে মির্যা সাহেব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি নিম্নে পত্রস্থ করা হল :

সমাচার

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম সালানা জলসা [বার্ষিক সম্মেলন] অতি সফলতার সাথে গত ২৪, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদেশের ১৭টি জেলা হতে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যগণ উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আল ফোরকান পত্রিকার সম্পাদক প্যালেষ্টাইন ও মধ্য প্রাচ্যের প্রাক্তন মুসলিম মিশনারী মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, পূর্ব আফ্রিকার প্রাক্তন প্রধান মুসলিম মিশনারী মাওলানা শেখ মোবারক আহমদ সাহেব এবং সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব উক্ত সম্মেলনে যোগদান করার জন্য রাবওয়া থেকে ঢাকা আগমন করেন।

সম্মেলনে বর্তমান বিশ্বে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ, ইসলাম ও জাতীয় ঐক্য, বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচার, কুরআন শিক্ষা ও প্রচারের গুরুত্ব এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শের ওপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়।

বর্তমান বিশ্বে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভাষণ দানকালে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাক্তন মুসলিম মিশনারী মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব বলেন, মানুষ ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যতই জড়বাদিতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, বিশ্বের সমস্যা ততই গুরুতর রূপ ধারণ করে বিশ্ববাসীকে আতঙ্কগ্রস্ত করছে।

পূর্ব আফ্রিকার প্রাক্তন প্রধান মুসলিম মিশনারী মাওলানা শেখ মোবারক আহমদ সাহেব বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচার শীর্ষক ভাষণে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং বিশ্বময় ইসলাম প্রচার করা আজ সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

(চলবে)

ইব্রাহীমি কুরবানী চির প্রবহমান হোক

মাহমুদ আহমদ সুমন

'ঈদুল আযহিয়া' নাম রাখার কারণ হলো এটি কুরবানীর ঈদ। এই ঈদ যিল হাজ্জ মাসের ১০ তারিখ হজ্জের ইবাদতের শেষে উপস্থিত হয়। (হজ্জ ৯ তারিখে হয়)। হযরত রসূল করীম (সা.) এই ঈদকে ঈদুল আযহিয়া বলেই উল্লেখ করেছেন। 'আযহা' শব্দ আরবী ভাষায় 'আযহী' শব্দের বহুবচন, যেমন 'আযহী' আযহিয়াতুল' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হল কুরবানীর জন্তু । ইসলামী পরিভাষায় এর অপর নাম হল 'ইয়াউমুন-নহর'। 'নাহর' অর্থও কুরবানীর জন্তু। উভয় নামই স্বয়ং আঁ হযরত (সা.) ব্যবহার করেছেন এবং হাদীসে বহুরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দু'টি নাম ছাড়া এ দিনের জন্য হাদীসে অন্য কোন নাম ব্যবহৃত হয় নি। আমাদের এটিও স্মরণ রাখা দরকার যে হজ্জ উপলক্ষে যে কুরবানী হেরেম শরীফের সীমার মধ্যে করা হয়, কুরআন শরীফ এবং হাদীসে এর জন্য 'হাদ্‌য়ুন' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। 'আযহা' শব্দ ব্যবহার হয়নি। ঈদুল আযহিয়ার কুরবানীগুলির জন্য 'আযহা' শব্দ ব্যবহৃত হয়, যা গয়ের হাজী-রা (অর্থাৎ যারা হজ্জে যায়নি) নিজ নিজ গৃহে করে থাকেন।

বিভিন্ন সহীহ রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত যে, 'ঈদুল আযহা' হিজরতের পর দ্বিতীয় বর্ষে আরম্ভ করা হয়, (যুরকানী এবং তারিখুল খামেস)। এই প্রকারের ঈদ আঁ হযরত (সা.) এর জীবনে ৯/১০টি আগমন করে। অপরদিকে তিনি হজ্জ এক বার মাত্র করেছিলেন এবং সেই হজ্জই 'হাজ্জাতুল বিদা' নামে অভিহিত। এই হজ্জ হযরত রসূল করীম (সা.) হিজরতের ১০ম বর্ষে পালন করেন, (আরবী এবং ফাতাহুল বারী শারহে বুখারী)। এর আড়াই মাস পরেই রসূল করীম (সা.) এর ওফাত হয়।

পবিত্র কুরআন শরীফে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে হজ্জ সংক্রান্ত ইবাদত আরম্ভ হয় হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সময়ে, (সুরা হজ্জ)। হযরত ইব্রাহীম (আ.) খোদা তাআলার আদেশে তাঁর প্রথম পুত্র হযরত ইসমাঈলকে জল ও বৃক্ষ লতা শূন্য মক্কা উপত্যকায় এনে বাস করতে রেখে যান। সেখানে জীবন ধারনের কিছুই ছিল না। প্রকৃত পক্ষে এটিই ইব্রাহীম (আ.) এর ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য ছিল, যে স্বপ্নে তিনি দেখেছিলেন যে তিনি তাঁর পুত্রকে জবাহ করছেন। তখন খোদা তাআলা পুত্র কুরবানীর স্থানে বাহ্যিকভাবে পশু কুরবানীর আদেশ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ কুরবানীও কায়েম রইল। অন্য কথায় এটি ছিল 'প্রথম মানুষ ওয়াক্‌ফ' যা খোদার রাস্তায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। যাতে খোদা তাআলা হযরত ইসমাঈলকে তাঁর মৃত্যুর পর এক নব জীবন দিয়ে তাঁর বংশের বীজ বপন করেন। অবশেষে এই বীজ থেকে বিশ্ব ধর্ম বিধানের বাহক, শ্রেষ্ঠ আদম সন্তান নবী গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এর জন্ম হয়। হজ্জে কুরবানীর প্রথা, ইসমাঈল (আ.) এর এই কুরবানীর একটা বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা, যদ্বারা এই অতুলনীয় কুরবানীর স্মৃতি চির প্রবাহমান রয়েছে। তাঁর পবিত্র বংশধররা বাহ্যিক জলশূন্য, ঘাস তরুলতা-ফল-ফুল শূন্য মক্কা উপত্যকায় সেই অনুপম ফল উৎপাদন করলো, যার ফুৎকারে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিকতা সজীব হলো, সজীব আছে এবং চিরকাল থাকবে। এই জন্য আঁ হযরত (সা.) বলতেন "আমি দুই যবেহ্‌কৃত সত্ত্বার পুত্র" (তারিখুল খসিস)। এই দুই কুরবানীর মধ্যে এক হলো ইসমাঈলের দেহ। যাকে জল-শূন্য, বৃক্ষ-লতা-শূন্য মক্কা উপত্যকায় বাস করতে দেওয়া কার্যত যবেহ্ করারই শামিল। দ্বিতীয় হযরত রাসূল (সা.) এর পিতা আব্দুল্লাহ্‌র কুরবানীর বিষয়টি। 'ঈদুল আযহার' কুরবানী পবিত্র কুরবানীর স্মৃতি রক্ষক। কিন্তু এ যুগে আধ্যাত্মিক অবনতি এবং জড়োন্নতিতে মানুষ এই মহান আজিমুশ্বান কুরবানী স্মরণ রাখাতো দূরের কথা আজ অধিকাংশ মুসলমান 'ঈদুল আযহা' নামটি কেন হয়েছে তাও স্মরণ করতে চায় না। একটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার যে ঈদুল আযহার নামায শুধু গয়ের হাজীদের জন্য নিরূপিত, হাজীদের জন্য নয়। এই নামায হজ্জে পালন করা হয় না। এর কারণ, হজ্জ স্বয়ং একটি পরম ঈদ'। যেহেতু এতে ঈদের সব বিষয়ই পূর্ণতম মাত্রায় পাওয়া যায়। যেমন (১) ইবাদত (২) মুমেনদের সম্মেলন (৩) আনন্দ (৪) 'আউদ' অর্থাৎ বার বার এই দিনের আগমন। এই জন্যই শরীয়ত 'ঈদুল আযহার' নামায শুধু গয়ের হাজী গৃহবাসী 'মুকীম' ব্যক্তিদের জন্য রেখেছেন যাতে এক দিকে যেমন হজ্জের সময়ে হাজীগণ হজ্জের ঈদ করেন, তেমনি গয়ের হাজীরা যারা কোন বাধ্যতামূলক কারণে হজ্জ করার সামর্থ লাভ করেন, তারা বিশ্বের কোণায় কোণায় স্ব-স্ব স্থানে ঈদ এবং কুরবানী করে সেই মহান কুরবানীর স্মৃতি জাগ্রত করেন, যা হযরত ইব্রাহীমের হস্তে হযরত ইসমাঈলের ব্যক্তিত্বে আরম্ভ হয়েছিলো এবং পরে আঁ হযরত (সা.) এর ব্যক্তিত্বে যা উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল। সুতরাং হাদীসে যেখানেই 'ঈদুল আযহার' নামায প্রসঙ্গে আঁ হযরত (সা.) এর এবং তাঁর সাহাবাদের কুরবানীর কথা বর্ণনা হয়েছে সেখানেই অপরিহার্যক্রমে গয়ের হাজীদের কুরবানীকে বুঝতে হবে।

ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী করার

গুরুত্ব যে কত ব্যাপক তার আলোচনা করা প্রয়োজন। আঁ হযরত (সা.) 'ঈদুল আযহা' উপলক্ষে নিজেও কুরবানী করতেন এবং তার সাহাবীদেরকেও কুরবানী করার জন্য তাগিদ দিতেন। এই ব্যাপারে অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে হাদীসে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বলেন যে, আঁ হযরত (সা.) হিজরতের পর মদিনায় দশ বৎসর যাপন করেন এবং তিনি প্রতি বৎসরই 'ঈদুল আযহা' উপলক্ষে মদীনায় কুরবানী করতেন" (তিরমিযী)। শুধু তাই নয়, 'ঈদুল আযহার' কুরবানীর প্রতি তাঁর (সা.) এতদূর খেয়াল ছিল যে তিনি ওফাতের পূর্বে তাঁর জামাতা ও পিতৃব্য পুত্র হযরত আলী (রা.)কে ওসীয়্যত করেন যে, তাঁর পরেও (ওফাতের পর) তাঁর পক্ষে ঈদুল আযহা' উপলক্ষে সর্বদা যেন কুরবানী করা হয়। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, "হযরত হাবসা (রা.) বলেন যে, তিনি হযরত আলীকে দেখলেন 'ঈদুল আযহা'-য় দুটি দুম্বা কুরবানী করছেন। তিনি হযরত আলী (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন দুই দুম্বার কারণ কি? হযরত আলী (রা.) বললেন যে তাঁকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ওসীয়্যত করেছেন যেন তিনি তাঁর পক্ষে (তাঁর ওফাতের) পরেও কুরবানী করতে থাকেন। এই জন্য তিনি আঁ হযরত (সা.) এর পক্ষে কুরবানী করেন" (আবু দাউদ) । ঈদুল আযহার দিন কুরবানী করা আঁ হযরত (সা.) এর শুধু ব্যক্তিগত কর্মই ছিল না। বরং তিনি তাঁর সাহাবাদেরকেও এর তাহরীক করতেন। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে "হযরত বারা (রা.) রেওয়ায়েত করেন যে, আঁ হযরত (সা.) ঈদুল আযহার দিন খুতবা দেন এবং বলেন যে এই দিন প্রথমে মানুষ ঈদের নামায পড়বে এবং তার পর কুরবানী করবে। সুতরাং যে এইরূপে করে সে তাঁর (সা.) সুন্নতকে লাভ করেছে" (বুখারী ও মুসলিম)। আরেক স্থানে তিনি বলেন "যার আর্থিক সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ঈদুল আযহা উপলক্ষে কুরবানী করে না, সে কেন আমাদের ঈদগাহে এসে নামাযে শামিল হয়?" (মুসনাদ আহমদ)। হযরত রসূল করীম (সা.) এর এই কথাকে সাহাবারা (রা.) খুব ভালভাবেই স্মরণ রেখেছিলেন এবং সাধ্যমত কুরবানী করতেন, রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, জাবল ইবনে সহীম বলেন যে এক বার এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঈদুল আযহার কুরবানী কি জরুরী? তিনি বললেন যে রসূলুল্লাহ্ নিজে কুরবানী করতেন এবং তাঁর অনুবর্তিতায় সাহাবাগণও কুরবানী করতেন। ঐ ব্যক্তি তার প্রশ্নটি পুনরুত্থাপনপূর্বক বললেন, কুরবানী কি ওয়াজিব? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বললেন, তুমি কি আমার কথা বুঝতে পার না? আমি বলি যে রসূলুল্লাল্লাহ্ (সা.) নিজেও কুরবানী করতেন এবং তাঁর অনুবর্তীতায় অন্য মুসলমানরাও করতেন" (তিরমিযী)।

আঁ হযরত (সা.) এর এই কাজ শুধু ব্যক্তিগত শখ অথবা বন্ধু-বান্ধব এবং দরিদ্রদেরকে গোশ্ত খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে নয় বরং তিনি একে একটি ধর্মীয় এবং পুণ্য কাজ মনে করতেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যায়েদ বিন আরকাম (রা.) বলেন যে, রাসূল করীম (সা.) এর সাহাবারা (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রসূলুল্লাল্লাহ্ ঈদুল আযহার এই যে কুরবানী, এগুলি কেমন? আঁ হযরত (সা.) বললেন, তোমাদের প্রধান পূর্ব পুরুষ ইব্রাহীমের প্রবর্তিত রীতি (সুন্নত)। সাহাবারা বললেন, তবে আমাদের জন্য এতে লাভ কি? তিনি বললেন, 'কুরবানীর জন্তুর প্রত্যেকটি লোম কুরবানীকারীর জন্য এক একটি পুণ্য, যা তাকে খোদার কাছে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য করবে" (ইবনে মাজা)। হযরত আয়েশা (রা.) রেওয়ায়েত করে বলেন যে, আঁ হযরত (সা.) ঈদের কুরবানী সম্বন্ধে বলতেন "খোদা তাআলার দৃষ্টিতে ঈদুল আযহার দিন মানুষের কোন কর্ম কুরবানীর জন্তু জবেহ্ করা এবং তার রক্তপাত অপেক্ষা প্রিয়তর নাই" (তিরমিযী)। এখানে 'রক্তপাত' শব্দে প্রাণী কুরবানীর গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণই মূল উদ্দেশ্য। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন এক ঈদ উপলক্ষে আঁ হযরত (সা.) একটি দুম্বা এনে স্বহস্তে জবেহ্ করেন এবং জবেহ্ করবার সময় বললেন, আমি আল্লাহ্র নাম নিয়ে জবেহ্ করছি'। তারপর দোয়া করলেন, আল্লাহ্ তুমি এই কুরবানী মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদের উম্মতের পক্ষ হতে কবুল কর" (সহিহ মুসলিম)। উপরোক্ত হাদীসগুলোর বরাতে আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছি যে কুরবানীর গুরুত্ব কত ব্যাপক। কুরবানীর আদেশ রয়েছে বলে যে কোন ধরনের পশু কুরবানী করলেই চলবে না। কুরবানীর পশু নিখুঁত হওয়া চাই, এই ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কুরবানীর মূল তত্ত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, পঞ্চম ইবাদত কুরবানী। বহুলোক ইসলামী কুরবানীর মূল তত্ত্ব বুঝতে পারে না। তারা মনে করে যে, ইসলামী কুরবানীর আদেশ দেওয়ার কারণ যাতে কুরবানীকারীর গুণাহ কুরবানী উঠিয়ে নিয়ে যায়। এটা ঠিক নয়। ইসলাম কখনো এই শিক্ষা দেয় না। কুরবানী 'কুরব' (নৈকট্য) হতে উদ্ভুত। প্রকৃতপক্ষে কুরবানী একটি একান্ত সূক্ষ্ম কর্ম প্রকাশিত ভাষা যা না বুঝায় লোকের ভ্রান্তি জন্মেছে। স্পষ্ট কথা, পৃথিবীতে বহুরূপ কার্যে সঙ্কেত ও চিত্রসঙ্কেত স্বরূপ ভাষার প্রচলন আছে। কথ্য ও লেখ্য ভাষায় বহু উন্নতি সত্ত্বেও ভাব প্রকাশের এই প্রাচীন পদ্ধতি এখনো পৃথিবীতে পাওয়া যায়। লোকে এর প্রভাব গ্রহণ করে। সাঙ্কেতিক ভাষা আমাদের দৈনন্দিন কাজ কর্মে সর্বদা ব্যবহৃত হয়। তদ্দারা মহৎ উপকরণ

পাওয়া যায়। কুরবানীও এর অন্তর্গত। চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রাণী হত্যা কোন সাধারণ বিষয় নয়। মানব প্রকৃতির উপর এর গভীর প্রভাব হয়। অবশ্য তাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা প্রাণী হত্যা করায় অভ্যস্থ। এছাড়া অন্য লোকের প্রকৃতির ওপর নিশ্চয়ই প্রাণী হত্যার প্রতিক্রিয়া হয়। এখন তার ভাবধারায় এক ব্যাপক আলোড়ন জন্মে। এমনকি এরই প্রতিক্রিয়া বশতঃ কোন জাতি কুরবানীকে যুলুম বলে নির্দেশ করে। তাদের এই কার্য দুর্বলতার লক্ষণমাত্র। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নাই যে, কুরবানীর প্রভাব মানব প্রকৃতির ওপর নিশ্চয় হয়। এই প্রভাবের সম্পাদনের জন্য কুরবানীকে ইবাদতের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য কুরবানীকারী যেন কুরবানী দ্বারা সাঙ্কেতিক ভাষায় একথা স্বীকার করে যে, পশুটি ক্ষুদ্র বলে তার জন্য যেমন কুরবান গিয়েছে তেমনি সে স্বীকার করে যে, তার চেয়েও বড় জিনিষগুলোর জন্য তাকে প্রাণ দিতে হলে আনন্দে প্রাণ দিবে। এখন ভাবুন দেখি, যে ব্যক্তি কুরবানী করে এবং এর অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝেই কুরবানী করে, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপর কত গভীর এ প্রতিক্রিয়া হবে এবং সে তার কর্তব্য কেমন স্মরণ রাখবে। যা স্রষ্টার দিক হতে তার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। এই প্রাণী হত্যার কথা চিরদিন তার হৃদয়ে সম্যক জাগরূক থাকবে। তার অন্তকরণ সর্বদা তাকে বলতে থাকবে, দেখ, তুমি স্বহস্তে ছাগ জবেহ্ করে একথা স্বীকার করেছো যে, নীচ উচ্চের জন্য কুরবানী হয়ে থাকে। সুতরাং তুমিও সেই কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হও, যা সত্য প্রতিষ্ঠা বা মানব জাতির দুঃখ বিমোচনার্থে তোমার করা কর্তব্য। এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পূর্বক কুরআনে বলা হয়েছে "আল্লাহ্ তাআলার কাছে তোমাদের কুরবানীর মাংসও পৌঁছে না এবং রক্তও পৌঁছে না" (সূরা হজ্জ)। অর্থাৎ কুরবানী করার উদ্দেশ্য পূর্ণ করলে শুধু মাত্র কুরবানী ফল লাভ করবেনা রক্ত পাত ঝরানোর সাথে মাংস খাওয়াও হবে। নইলে কোন প্রকৃত ফল লাভ হবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'ঈদুল আযহার' গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে একস্থানে বলেন, "এই মাস কুরবানীর মাস বলে অভিহিত হয়। রাসূল করীম (সা.) প্রকৃত কুরবানীর পূর্ণতম আদর্শ প্রদর্শনার্থে মহাসম্মেলন করেন। তোমরা যেমন ছাগ, উট,গরু জবেহ্ কর তেমনি ঐ সময় ছিল যখন তেরশত বৎসর পূর্বে খোদা তাআলার পথে মানুষ জবেহ্ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তাই 'ঈদুয্ যুহা'-ই ছিল। যার (মধ্যাহ্নের সন্নিহিত পূর্বের) আলোক তাতে ছিল। এই যে সব কুরবানী । এগুলি অভ্যন্তরীণ বস্তু নয়। বাহ্যাচরণ মাত্র, আত্মা নয় দেহ। বর্তমানে আরাম আয়েসের সাথে হাসি-খুশির মধ্যে ঈদ পালন হয়। হাসি-খুসি এবং নানা প্রকার ভোগ বিলাস ঈদের পরম উদ্দেশ্য পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রকৃত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য নাই। প্রকৃত পক্ষে, এইদিনের মধ্যে এই মহান উদ্দেশ্য নিহিত ছিল যে, হযরত ইব্রাহীম যে কুরবানীর বীজ সংগোপনে বপন করেন, আঁ হযরত (সা.) তার পরিণত শস্য শ্যামল ক্ষেত্র প্রদর্শন করেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) খোদা তাআলার আদেশ পালনে আপন পুত্রকে জবেহ করতে কুণ্ঠিত হন নাই। এতে অলক্ষ্যে এই সঙ্কেত ছিল যে, মানুষ সম্পূর্ণরূপে খোদার হবে এবং খোদার আদেশের সম্মুখে তার প্রাণ, সন্তান ও আত্মীয় স্বজনের রক্ত তুচ্ছ বলে দেখবে। দেখবে রসূলুল্লাল্লাহ্ (সা.) এর সময় যাবতীয় পবিত্র নীতির পূর্ণতম আদর্শ ছিল। তখন কুরবানী কিরূপ হয়েছিল? রক্তে জঙ্গল ভরে গিয়ে রক্ত নদী প্রবাহিত হয়। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে হত্যা করে। এ প্রকারে তারা এই বলে আনন্দিত হতো যে ইসলাম এবং খোদার পথে খন্ড-বিখন্ড হওয়াতেই তাদের সুখ। কিন্তু আজ চিন্তা করে দেখ, হাসি-খুশি এবং নিরর্থক কার্যাদি ছাড়া রূহানিয়তের কোন্ অংশ পাওয়া যায়?" (মলফূযাত দ্বিতীয় খন্ড, ১৫ জুন ১৯৬২ সনের পাক্ষিক আহমদীর সৌজন্যে)।

আর ক'দিন পরেই আমরা ঈদুল আযহিয়ার ঈদ উপযাপন করতে। ঈদ হল আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) এর পছন্দনীয় একটি ধর্মীয় ইবাদত এবং ধর্মীয় উৎসব। ঈদ পালনের শরীয়ত নির্দেশিত কিছু বিধি-বিধান রয়েছে, যা পালনে সামাজিক জীবনে পারস্পরিক আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও ফজল সুসংহত হয়। কুরবানী ঈদে শরীয়ত সম্মত দিক হলো, ঈদুল আযহার নামায শেষে ইব্রাহীম (আ.) এর রীতি মোতাবেক পশু জবাই করে শরীয়ত বিধান মতে বন্টন করাই হলো ইবাদত। এ রকম ঈদই সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল (সা.) এর জীবনে পালিত হয়েছে। এ রকম ঈদ মানুষের দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধ ও তাক্ওয়া হাসিলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এতে পরস্পরের ঈমানী ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা দূর হয়ে এক স্বর্গীয় পরিবেশে চরম ও পরম আনন্দ অনুভব হয়, এটার নামই প্রকৃত ঈদ। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে কুরআন হাদীসের আলোকে জীবন পরিচালিত করে না তাদের জন্য ঈদ নয়। তাদের জন্য এ ঈদ একটি হৈ-হল্লা ও মেলা বৈ কিছু নয়।

মহান খেদা তাআলা আমাদের সকলকে প্রকৃত অর্থে ঈদুল আযহার গুরুত্ব বুঝার তৌফিক দান করুন এবং আমরা যেন সেই ইব্রাহীমি কুরবানীকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে পারি। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে বিগলিত সেই হৃদয় দান করুন, আমীন।

মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর

মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ

যারা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলাকে অদ্বিতীয় এক বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাদের সেজদার স্থানকে মসজিদ বলা হয়। সেজদা অর্থ অনুগত হওয়াকে বুঝায়। যিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করেন—তিনি একজন মুসলিম অর্থাৎ যিনি গর্হিত কাজকর্ম ও চিন্তা-ভাবনা থেকে নিজ প্রবৃত্তিকে রক্ষা করার সংকল্পে নিয়োজিত থাকেন এবং অপরের নিরাপত্তা দেন তিনিই মুসলিম। এরূপ মুসলিম মানুষের অধিকার ও আল্লাহ্‌র অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। এইরূপ মানুষ যখন একত্রিত হয়ে একটি গৃহে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করেন সেই স্থানকে মসজিদ বলা হয়। আর মাছ যেমন পানি ছাড়া বাঁচে না তেমনি একজন সত্যিকার মু'মিন মুসলমান মসজিদ ছাড়া জীবন লাভ করতে পারে না। মসজিদকে পৃথিবীর জান্নাত বলা হয়—যার ফল হয় আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণ কীর্তন (তস্‌বীহ ও তাহমীদ)। যেখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়, সেখান থেকে শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনাতে মসজিদে সমবেত হয়ে এক আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতেন এবং ইসলাম প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন।

বর্তমানে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। সূরা ফাতেহার উল্লেখিত নেয়ামত স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন—কেননা আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নূর ও আলো কুরআন ও ইসলাম ধর্মকে হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)এর জামানায় একই রমজান মাসে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ হবে, মুসলমানেরা দলে দলে বিভক্ত হবে, ফাসেক ব্যক্তি সমাজের নেতা হবে, আলেমগণ নিকৃষ্টতর জীব হবে, জীবজন্তু একত্র হবে (চিড়িয়া খানায়), উট বেকার হবে (উহাতে কেউ চড়বে না), মুসলমানদের কোন একক নেতা থাকবে না। এইরূপ অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বহুধা বিভক্ত মুসলিম জাতির এক নেতার অধীনে একত্র করার জন্য এক রজ্জু হিসাবে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে আবির্ভূত করেছেন এবং বিশ্বের অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব সহকারে তাঁকে প্রেরণ করেছেন। তিনি সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন। ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল আপত্তি এবং মুসলমানদের সকল অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে তিনি আল কুরআনের আলোকে সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর লেখনী পড়লে মানুষ তা অবশ্যই দেখতে পাবে। আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)কে 'লেখনী সম্রাট' আখ্যা দিয়েছেন—এবং আল কুরআনের মাধ্যমে দোয়াত ও কালির কসম খেয়েছেন এবং পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম মাহদী (আ.)-এর লেখনী পড়লে আত্মায় পুলকিত শিহরন জাগবে, আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জিত হয়ে আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক তিনি আবির্ভূত হলে তাঁকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর হাতে বয়আত বা দীক্ষা নেবার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁকে হযরত (সা.) তাঁর সালাম পৌঁছাতে এবং সাহায্য করার আদেশ দিয়েছেন। শেষ জামানায় ইসলাম ৭৩ ভাগ হবে। একদল হবে জান্নাতি বাকী ৭২ দল—তাদের কোন ঐশী নেতা থাকবে না যে কারণে তারা বয়আত না করেই মৃত্যুবরণ করবে। "যুগ ইমামের হাতে বয়আত না করে যারা ইহলোক ত্যাগ করবে তারা জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে"—আল হাদীস। বহুধা বিভক্ত মুসলমানগণ যতই ধর্ম কর্ম করুক না কেন যুগ ইমামের হাতে বয়আতের মাধ্যমে তাদের শুভ পরিণাম হবে অন্যথায় নয়। তাই সমগ্র মানবজাতিকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে এক জামা'ত গঠন করেছেন—যার নাম "আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত"। তিনি বিশ্বের অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদকে অসম্পূর্ণ প্রমাণ করে ইসলামকে পরিপূর্ণ ধর্মরূপে সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ করে তিনি ১৯০৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর আল কুরআনের সূরা নূর এর ৫৬ আয়াত অনুযায়ী তাঁর জামা'তে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই খিলাফত চিরস্থায়ী যা আর কখনো ভাঙ্গবে না। এই খিলাফতের মাধ্যমে ইসলামের বিশ্ব বিজয় হবে (সূরা সাফ), আর কোন মাহদী আসবে না আমাদের চার পাশের সকল ধর্মাবলম্বীদের কাছে শান্তির ধর্ম ইসলামকে যুক্তি প্রমাণাদি দিয়ে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। যুক্তি প্রমাণাদি দিয়ে বুঝাচ্ছি যে, ইসলাম মানবজাতির সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। অন্যান্য ধর্ম বিশেষ বিশেষ জাতির জন্য এবং স্থান ও কালের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন একমাত্র ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণ এবং সারা বিশ্বের সকল জাতির সকল মানুষের জন্য। ইসলাম ধর্ম কালের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। সূর্য্য যেমন সারা বিশ্বের সকল মানুষকে সমভাবে তার আলো দ্বারা উপকার সাধন করে তেমনি ইসলাম ধর্ম সকল কালের সকল মানুষের জন্য কল্যাণ বর্ষণ করে। সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন মানবজাতির এমন কোন সমস্যা

নেই যার সমাধান দেয় না। ইসলাম একটি পূর্ণ ধর্ম ব্যবস্থা, এতে কোন জাতিভেদ নেই, শ্রেণীভেদ নেই। ইসলাম-মানব জাতির শেষ ধর্ম শান্তির ধর্ম, নিরাপত্তা উন্নতি ও সমৃদ্ধির ধর্ম। ধর্ম বিধানে আল কুরআন সকল সন্দেহের উর্ধ্বে। এতে কোন সন্দেহ ভুল ভ্রান্তি বা প্রক্ষেপন নাই। আল্লাহ্ এটাকে অর্থাৎ কুরআনের বিধানকে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। সকল ধর্মের সার শিক্ষা এতে সন্নিবেশিত ও সংরক্ষিত আছে। এটা এক মহা পাঠ্য-আল কুরআন। এই বাণী অবতরণের সময় হতে আজ পর্যন্ত হুবহু সংরক্ষিত আছে। ১৪০০ বছর পূর্বে লেখাপড়ার যুগের সূচনায় এর অবতরণ হয়। মানব জাতিকে এক ধর্মে একত্র করার যুগেরও সূচনা হয় ঐ সময় হতে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য দয়াস্বরূপ প্রেরণ করেন। হযরত (সা.) এর আগমনের মাধ্যমে বিশেষ স্থানের বিশেষ জাতিতে অবতার বা নবী রসূলের আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। যেহেতু মানব জাতি এখন যোগাযোগের দিক দিয়ে এক বিশ্ব পরিবারভুক্ত তাই আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতিকে একই ধর্ম ইসলাম নির্ধারণ করেছেন। বিভিন্ন ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণীতে তাদের হেদায়াতের জন্য কলিযুগে বা শেষ যুগে যে সব মহাপুরুষের আগমনের কথা আছে তা এখন ইসলামের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। হিন্দুদের জন্য আলাদা করে কলকি অবতার আর আসবে না, মুসলমানদের ইমাম মাহদী, খৃষ্টানদের যীশু, বৌদ্ধদের মৈত্রেয় এখন একই ব্যক্তির আগমনে পূর্ণ হয়েছে-তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি মানবজাতির কাছে নির্দিষ্ট সময়ে অকাট্য যুক্তি, নিদর্শন ও দোয়ার কবুলিয়তের মোজেজা সহ আগমন করেছেন। সকল ধর্মের অনুসারীদের নিরপেক্ষ মন নিয়ে আমাদের অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদে এসে তাদের সন্দেহ নিরসনের আহ্বান জানাই। এ উপলক্ষে আমি সকলকে অর্থাৎ মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে বই পুস্তক বিতরণ করেছি। যুক্তি প্রমাণাদি দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করেছি-এই ধারা অব্যাহত আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ্, আমাদের চার পাশের লোকদেরকে এখানে বসবাসরত সকলকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তবলীগ পৌঁছানোর জন্য নওবেকী হালকায় (আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন, গ্রাম ছোটকুপট শ্যামনগর, সাতক্ষীরা) একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। যারা একেশ্বরবাদী, যারা সৃষ্টির পূজা করবে না (কেননা সৃষ্টি পূজা কোন ধর্মগ্রন্থে নাই) তারা এখানে আসুন এবং ইসলামের অতুলনীয় সৌন্দর্য ও কল্যাণময় শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে মানব সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করুন।

হিন্দু ভাইদের বলি,-শ্রীকৃষ্ণ একজন মানুষ ছিলেন। তিনি একজন মহান নবী বা অবতার ছিলেন। তিনি বিয়ে শাদী করেছিলেন। তাঁর কয়েকজন স্ত্রী-ও বহু সন্তান ছিল। তিনি মানুষের সংশোধন কল্পে ভারতে এসেছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি কোন মূর্তিকে পূজা করেন নাই। তিনি একজন প্রকৃত ঈশ্বরপ্রাপ্ত বা আল্লাহ্ভক্ত ছিলেন। তেমনি যীশু বা ঈসা (আ.) ঈশ্বরপুত্র ছিলেন না। মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। বনি ইসরাঈলী ১২টি গোত্রের জন্য এসেছিলেন। একত্ববাদ ঘোষণা করেছিলেন, ত্রিত্ববাদী ছিলেন না।

অতএব, আজ আমরা এসব প্রমাণ আল কুরআনের মাধ্যমে লাভ করছি। গ্লানি, শ্রেণী বিদ্বেষ, হিংসা, হানাহানি বর্জন করে "সকলের জন্য ভালবাসা ঘৃণা নয় কারো জন্য"-আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফার এই বাণীর আলোকে একটি শান্তিপূর্ণ মানব সমাজ গঠনের জন্য চেষ্টা চলছে পৃথিবীব্যাপী সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের কাছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ইমাম মাহদী অর্থাৎ কলি যুগের অবতারের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর নেতৃত্বে জাতিতে জাতিতে ইসলাম প্রচারের কাজ চলছে। বর্তমান বিশ্বে ১৯৫ টি দেশে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর কোটি কোটি মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো হয়েছে এবং মসজিদ ও প্রচার কেন্দ্র তৈরী হচ্ছে-ফলে কোটি কোটি লোক এ জামা'তে প্রবেশ করে শান্তির ধর্ম, মানবতার ধর্ম ইসলামের বিজয়বার্তা ঘোষণা করছেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রহমত থেকে কল্যাণ লাভ করছেন। তারই আলোক সম্পাত "ইমাম মাহদী মসজিদ" নওবেকী হালকা, ছোটকুপট, পোঃ নওবেকী, জেলা-সাতক্ষীরা, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সুন্দরবন। আল্লাহ্ মানবজাতিকে যত দ্রুত সম্ভব এ সত্যকে বুঝবার ও গ্রহণ করবার তৌফিক দিন। একশত কুড়ি বছর যাবত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাফল্যের ধারা অব্যাহত আছে। বর্তমান বছরে ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ব্যক্তি এ জামা'তে দাখিল হয়েছেন। আল্লাহ্র তরফ থেকে দাবী করে কেহ এতোদিন সাফল্যের পর সাফল্য লাভ করতে পারে না। আল্লাহ্ সত্যকে বিজয় দেন আর মিথ্যাকে ধ্বংস করেন।

"এবং কে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যালেম, যে আল্লাহ্র মসজিদ সমূহে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয় এবং সেগুলির ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়? তাদের জন্য আদৌ সংগত ছিল না যে, (আল্লাহ্র) ভয়ে ভীত না হয়ে তারা ঐগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। তাদের জন্য পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা এবং পরকালেও মহা আযাব।"-আল কুরআন (সূরা বাকারা ১১৫ নং আয়াত)।

চলুন আমরা ভাল হই

এনামুল হক রনী

কথায় বলে ভাল হতে পয়সা লাগে না, ভাল হয়ে যান। কথাটি কথার কথা হলেও ভেবে দেখছেন কি? কথাটি আসলে সত্য কথা, বাস্তব কথা। কারণ একজন মানুষ সে যদি নিজেকে ভাল মানুষ বানাতে চায় তবে তার টাকা-পয়সা ধন-সম্পদ হাতি ঘোড়া, গাড়ী বাড়ী, সৈন্য সামন্ত ইত্যাদি প্রয়োজন পড়ে না, প্রয়োজন পড়ে আন্তরিক ইচ্ছা শক্তি। যেমন ধরুন আপনার ইচ্ছা হলো আপনি আজ একটা ভাল কাজ করবেনই। এতে আপনাকে সর্বপ্রথমে ইচ্ছা করতে হবে। যদি ইচ্ছা শক্তিই প্রথমে সৃষ্টি না হয় তবে অন্যদিকে যাওয়া বা সামনে এগুনো যাবে না। এখন ঐ যে আপনার ইচ্ছা আজ একটা ভাল কাজ করবেনই। তাই আপনাকে ভাল কাজের ইচ্ছাটাকে উদ্দেশ্য করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। বেশ তাই আপনি ধরুন ঘর থেকে বের হলেন, রাস্তায় এসে পড়লেন, আপনার মনটা ভাল কারণ আপনি ভাল কাজ করতে যাচ্ছেন। পথে একজন লোকের সাথে দেখা হলো। যেহেতু আজ আপনার মনটা ভাল তাই হাঁসি মুখে ঐ ব্যক্তিকে সালাম দিলেন *আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।* লোকটি উত্তরে, ওয়া আলায়কুম আস্‌সালাম বললেন। সামনে রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে পথের মধ্যে দু'টো কলার খোসা ও একটি ইটের বড় টুকরা পড়ে থাকতে দেখে আপনি রাস্তা থেকে সেগুলো সরিয়ে দিলেন। পাশে হেঁটে যাওয়া দুজন লোক আপনার এই ভাল কাজটি দেখে দু'জন বলাবলি করছে লোকটি ভাল লোক। এখন লক্ষ্য করেছেন কি? ভাল হতে পয়সা লাগে না। আরো লক্ষ্য করুন আপনিতো একটি ভাল কাজ করবেন ঠিক করেছিলেন কিন্তু খোদা তাআলা আপনাকে ২/৩ টি ভাল কাজ করার তৌফিক দিলেন। ১। আপনি হাসিমুখে সালাম দিয়েছেন এটা একটি ভাল কাজ। আর ২। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কলার খোসা অপসারণ করেছেন এটা ভাল কাজ ৩। রাস্তা থেকে ইটের টুকরা সরিয়েছেন এটা ভাল কাজ।

আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন. কেউ যদি হাসিমুখে প্রথমে সালাম বিনিময় করে তবে তার জন্য ১০ নেকী ধার্য করা হয়। তেমনি তিনি (সা.) বলেছেন, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু যে সরায় সে ঈমানের যে ৭০টির মতো শাখা আছে তার একটি শাখা অবলম্বন করলো।

যাই হোক ভাল কাজ করলে মনটা ভাল থাকে আর মন ভাল থাকলে আমরা ভাল ভাল চিন্তা করে নিজেরা ভাল হয়ে যেতে পারি। যেমন : এক ব্যক্তি এসেছিল রসূল (সা.) এর নিকট সে ভাল হতে চায় যদিও তার মধ্যে মারাত্মক অপরাধ আছে যেমন; সে মদ্যপান করে, সে জেনা করে, সে চুরি করে। এখানে লক্ষ্য করুন মারাত্মক অপরাধ থাকলেও ঐ লোকটি যে কিনা রসূল করীম (সা.)-এর নিকট এসেছে তার প্রবল ইচ্ছা সে ভাল হতে চায়। তার এরূপ ইচ্ছা শক্তি দেখে রসূলে করীম (সা.) তাকে ঔষুধ প্রয়োগ করলেন। কোন সে ঔষুধ দেখুন। রসূল (সা.) বললেন, একটা কথা শুনতে হবে শুধুমাত্র একটা কথা আর তা হল মিথ্যা বলা যাবে না। ঐ প্রবল ইচ্ছা শক্তির লোকটি যে ভাল হতে এসেছিল সে ওয়াদা দিল সে মিথ্যা বলবে না। সে যখন মদ পান করতে রওয়ানা দিতে ইচ্ছা করলো তখন তার মনে হলো প্রবল ইচ্ছার কথা সে ভাল হতে চায় তাই সে মিথ্যা বলবে না, তাই যখন সে ছোট এই ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করলো, তখন সকল মন্দ ইচ্ছা পরাভূত হলো আর প্রবল ইচ্ছা অর্থাৎ ভাল হতে চাওয়ার ইচ্ছা জয়যুক্ত হলো। এভাবে ঐ ব্যক্তি ভাললোকে পরিণত হলো। এখানে দেখেছেন কি? ভাল হতে কোন সে সম্পদ প্রয়োজন? ভাল হতে প্রবল ইচ্ছা শক্তি প্রয়োজন।

পবিত্র কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, "এবং তোমাদের মধ্যে এমন জামা'ত থাকা উচিৎ যারা ভাল কাজে ডাক দিবে এবং ভাল কাজ করতে বলবে ও খারাপ কাজ করতে নিষেধ করবে। আসলে এরাই সফলতা লাভ করবে। (আলে ইমরান : ১০৫)।

এই আয়াত দ্বারা ভাল কাজ নিজে করা, ভাল কাজের চর্চা করা ও মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা ভাল মানুষের লক্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই নিজেদের জীবনে সফলতা লাভ করতে হলে ভাল মানুষ হওয়ার জন্য আজীবন চেষ্টা করতে হবে।

এখন ভাল মানুষ কাকে বলে? কিভাবে ভাল মানুষ হওয়া যায়? কে সবচেয়ে ভাল মানুষ? এসব জানা দরকার।

মহান আল্লাহ্‌ তাআলার ঘোষণানুযায়ী সবচেয়ে সম্মানীত মানুষ হচ্ছে সে, যে সবচেয়ে মুত্তাকী। অর্থাৎ খোদাকে যে ভয়ভীতি বা ভক্তিশ্রদ্ধা করে চলে সে হচ্ছে ভাল মানুষ। এখন জানা দরকার কিভাবে মুত্তাকী হওয়া যায়। অর্থাৎ মুত্তাকী হওয়ার পথ বা রাস্তা কোনটি? আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর পাক কালামে শুরুতে সূরা বাকারায় উল্লেখ করেছেন, ইহা সেই কামিল কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই এটা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াতের রাস্তা দেখিয়ে দেয়। এই কিতাব হলো আল কুরআন যা পাঠ করে মুত্তাকীরা জানতে পারে কিভাবে ভাল হওয়া যায়।

আর এই কারণেই হয়ত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, *খায়রুকুম মান তায়াল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহু*। তোমাদের মধ্যে সে ভাল, যে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়। তাহলে কুরআন পড়া বা শেখা ও অন্যকে পড়ানো বা শেখানো ভাল মানুষের কাজ। এইদিক থেকে কুরআন পড়ার মাধ্যমে আমরা ভাল মানুষ হতে পারি। কে ভাল মানুষ? এ বিষয়ে কুরআন মজীদে একথা উল্লেখ আছে যে, কথায় বলে, সেই ব্যক্তি হলো ভাল যে লোকদের আল্লাহ্‌র পথে ডাকে, তার নিজ পরিচয় দেয় আমি মুসলমান (আল-হামীম আস্‌ সাজদা) এখানে আল্লাহ্‌র দিকে বা আল্লাহ্‌র পথে আসার জন্য যদি কেউ ডাক দেয় তবে সে ভাল মানুষ। আর যে পরিচয় দেয় আমি মুসলমান অর্থাৎ নিজের পরিচয় পরিস্কারভাবে তুলে ধরে তবলীগ করে তারা ভাল মানুষ।

এসব একজন ভাল মানুষের লক্ষণ। তাই আমরা যদি ভালো মানুষ হতে চাই আমাদের উপরোক্ত কাজগুলি করতে হবে। অর্থাৎ আমাদেরকে মুত্তাকী হতে হবে, হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)ও আমাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার জন্য বার বার বিভিন্ন ভাবে নসিহত করেছেন। তিনি (আ.) বলেছেন,..........আমি খুব চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, খোদা তাআলার দরবারে যে সম্মান পাওয়া যায় উহার আসল কারণ তাকওয়াই। যে মুত্তাকী সে জান্নাতে যাইবে। খোদা তাআলা তাহার জন্য ফয়সালা করিয়া ফেলিয়াছেন। খোদা তাআলার নিকট মুত্তাকীরাই সম্মানিত।" (মালফুযাত-৩য় খন্ড)

এখানেও মুত্তাকীরা সম্মানিত ও ভাল মানুষ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তাই আমাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ভাল মানুষ হওয়ার জন্য নিয়মিত–জারী রাখা উচিত। মহান আল্লাহ্‌ আমাদের ভাল মানুষ হওয়ার তৌফিক দিন।

জামা'ত ও অংগসংগঠনসমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

বৃহত্তর সিলেট জোনের ৩য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ ও ১৪ আগষ্ট ০৯ইং ৭টি মজলিস সমন্বয়ে তৃতীয় জেলা বার্ষিক ইজতেমা পাগুলিয়ায় (মৌলভী বাজার) অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

১৩ আগষ্ট রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেবের সভাপতিত্বে এবং শফিউল আলম বরকত রিজিওনাল নায়েম– জনাব জানে আলম, জেলা নায়েম–জনাব আব্দুল আওয়াল মাষ্টার; সাঈদ আহমদ খন্দকার ও জনাব আব্দুল করীম লন্ডনী স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অধিবেশন মসজিদে আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি জনাব সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেব, দোয়ার কবুলিয়তের নিদর্শন এর ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব সাঈদ আহমদ খন্দকার, আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য এই বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব শফিউল আলম বরকত, রিজিওনাল নায়েম। বিজয়ী প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ও রিজিওনাল নায়েম। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৬তম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা

গত ১৬ ও ১৭ অক্টোবর রোজ শুক্রও শনিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নবনির্মিত তিনতলা মসজিদ "বায়তুল ওয়াহেদ" ১৬তম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা ০৯ উদযাপিত হয়। ১৬ অক্টোবর রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ খাবারের পর ইজতেমার শুভ উদ্বোধনী অধিবেশন বিকাল ৪টায় আরম্ভ হয়। মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী সদর বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন এস, এম হাবীবুল্লাহ্‌ সাহেব। পরে আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম সভাপতি সাহেব। অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন মোশারফ হোসেন চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি ০৯। শেষ দিকে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মোহতরম সভাপতি সাহেব। সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ১৭ অক্টোবর বিকাল ৪ টায় আরম্ভ হয় মোহতরম মাহবুব আযম রেজা কায়েদ তবলীগ সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। সবশেষে আহাদ পাঠ ও ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম সভাপতি মাহবুব আযম রেজা সাহেব।

শফিউল আলম বরকত

ক্রোড়া, আখাউড়া ও বিষ্ণুপুর সমন্বয়ে ১০ম বার্ষিক আঞ্চলিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৩০, ৩১ জুলাই ক্রোড়া, আখাউড়া ও বিষ্ণুপুর সমন্বয়ে বার্ষিক আঞ্চলিক ইজতেমা ক্রোড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ জুলাই ০৯ইং বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব জনাব আব্দুল আওয়াল মাষ্টার, জনাব হুমায়ুন কবীর এর উপস্থিতিতে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। ৩১ জুলাই রোজ শুক্রবার ৮-৪৫ মিঃ ইজতেমার দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম সিলেবাস অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, বাংলা ও উর্দু নযম, নির্ধারিত বিষয়ের ওপর বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, দ্বীনি মালুমাত এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, কুইজ ও পয়গামে রেসানী এবং বিভিন্ন খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জুমুআ ইজতেমার সমাপ্তি অধিবেশন-এ জনাব সাইদ আহমদ খন্দকার, সাবেক আমীর ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। সবশেষে আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল মাষ্টার

শুভ বিবাহ

* গত ২০/০২/০৯ইং তারিখ মোছাঃ লাভলী আক্তার, পিতা-মৃত শরীফ আহমদ, বাসারুক এর সাথে নাসির আহমদ, পিতা-মৃত রহিছ মিয়া, তারুয়া এর বিবাহ ৬০,০০০/- টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ৮০১/০৯

* গত ১৫/০৯/০৯ইং তারিখ মিস রিক্ত পারভীন, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ মোড়ল, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর সাথে এস, এম, ফয়েজ উদ্দিন আহমদ, পিতা-এস, এম মতিউর রহমান, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর বিবাহ ৭৫,০০১/- (পচাত্তর হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ৮০২/০৯

* গত ০২/১০/০৯ইং তারিখ মোসাম্মাৎ মুক্তা পারভীন, পিতা-মোহাম্মদ জনাব আলী গাজি, ফুলতলি, সাতক্ষীরা এর সাথে মোহাম্মদ আব্দুল আলীম ঢালী, পিতা-মোহাম্মদ জামাত আলী ঢালী, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা এর বিবাহ ২৫,০০১/- (পঁচিশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ৮০৩/০৯

* গত ১০/০৭/০৯ইং তারিখ মোসাম্মাৎ নাদিরা আক্তার মোহাম্মদ মহসিন মিয়া ১০/৩ কুসুমবাগ কালিবাড়ী, সবুজবাগ, ঢাকা এর সাথে দেলোয়ার হোসেন, পিতা-আব্দুল কুদ্দুস, কান্দিপাড়া বি, বাড়ীয়া এর বিবাহ ১৫০,০০১/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ৮০৪/০৯

শোক সংবাদ

গত ১৫/১০/০৯ ইং তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার সদস্য জনাব আনিসুর রহমান ভূইয়া দুপুর ১ ঘটিকায় তার নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে মরহুম স্ত্রী, ২ ছেলে ও ৩ কন্যা রেখে গেছেন। মরহুমের বিদেহী আত্মা ও তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী

এনামুল হক

"এপক্ষের কৃষিতে করনীয়"
১৬ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর'০৯
২ অগ্রহায়ন হতে ১৬ অগ্রহায়ন

বিগত কয়েকটি সংখ্যায় আমাদের দেশের সব অঞ্চলে চাষ উপযোগী কয়েকটি শীতকালীন সব্জির চাষ প্রনালী নিয়ে আলোচনার পর আবার আপনাদের সন্মুখে এপক্ষে কৃষিতে করনীয় বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহী ওয়া বারকাতুহু।

চাষী ভাই, আমাদের দেশে কৃষিতে রবি মৌসুমের গুরুত্ব অপরিসীম। এ মৌসুমটি প্রাকৃতিক দূর্যোগ হতে নিরাপদ। সেচ সুবিধাযুক্ত প্রতি ইঞ্চি জমিতে আপনি ফসল ফলানোর উদ্যোগ নিন। তবে সময়মত যদি কাজ শুরু করতে না পারেন তা হলে আপনি কাঙ্খিত ফলন পাবেন না। চাষী ভাই এ পক্ষে আপনি নিম্নবর্ণিত কাজগুলি করতে পারেন:

১) আমন চাষ :- দেশের দক্ষিণ -পশ্চিম অঞ্চলের চাষী ভাইয়েরা এ পক্ষকালটি আপনাদের আমন ফসল কাটার ভর মৌসুম। শতকরা ৮০% ভাগ পাকলেই ফসল কেটে ঘরে তুলুন। বেশী পাকলে ফসলের মান ও ফলন দুই কমে যাবে।

চাষী ভাই, নিজের প্রয়োজনীয় বীজ নিজে রাখুন। বিএডিসি থেকে বীজ নিয়ে উৎপাদিত আমন ফসল থেকে পর পর দুই বছর বীজ রেখে ব্যবহার করুন। তৃতীয় বছরে আবার বিএডিসি থেকে বীজ সংগ্রহ করে ব্যবহার করুন।

বীজের জন্য রোগমুক্ত প্লট নির্বাচন করুন।

কাটার পূর্বে বীজ প্লট আর একবার বিজাত বাছাই করুন।

কাটার সাথে সাথে মাড়াই ও রৌদ্রে শুকিয়ে নিন। কোন অবস্থাতে গুমানো যাবে না।

দক্ষিণ অঞ্চল এবং সিলেট ও ব্রাহ্মনবাড়িয়ার অঞ্চলে আগাম উফশী জাতের আমন কাটার উপযুক্ত সময় । নাবী জাতের আমন এবং স্থানীয় জাতের আমনের এপক্ষে ফুল আসবে। ফুল আসার সময়ে খেতে পর্যাপ্ত পানি রাখর ব্যবস্থা করুন।

দক্ষিণ অঞ্চলের চাষী ভাইয়েরা এ পক্ষেও সামুদ্রিক ঝড়ের আশংকা আছে। তাই শতকরা ৮০% ভাগ পাকলেই ধান কেটে নিরপদ স্থানে মজুদ করুন।

২) ভুট্টা চাষ:- চাষী ভাই এপক্ষেও ভূট্টা চাষ করতে পারেন।

ভাল বীজ ব্যবহার করুন। হাইব্রিড ভূট্টা চাষ করুন। বিএডিসির বীজ ব্যবহার করুন। আপনি ভাল ফলন পাবেন। বিএডিসির বীজ বিক্রয় কেন্দ্র / বিএডিসির অনুমোদিত বীজ ডিলারের নিকট বীজ পাবেন।

ভূট্টার সাথী ফসল হিসাবে লালশাক , পালং শাক , ঢাকা -১ জাতের বাদাম চাষ করুন। অধিক লাভবান হোন।

চাষী ভাই ভূট্টা খেত আগাছামুক্ত রাখুন। ভাল ফলনের জন্য বপন থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত খেত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

চারা গজানোর ২৫-৩০ দিনের মধ্যে প্রথম কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে ২য় কিস্তি নির্ধারিত মাত্রায় ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করুন।

জমিতে ভাল নিষ্কাশনের ব্যবস্থ রাখবেন। মনে রাখবেন এ পক্ষেও প্রাকৃতিক দূর্যোগে(সামুদ্রিক নিম্নচাপের ফলে) ভারি বর্ষণ হতে পারে। বৃষ্টির পর পরই পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করবেন। ভূট্টা কাণ্ড মাটির উপড় না উঠা পর্যন্ত জলাবদ্ধতা হতে দেয়া যাবেনা।

বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ এবং ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে ২য় সেচ দিন।

৩) আগাম আঁখ চাষ:- চাষী ভাই, এ পক্ষকালেও আগাম আঁখ চাষ করতে পারেন। পত্যেক ফসলের ক্ষেত্রে রোগমুক্ত সুস্থ সবল বীজ ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী । তাই রোগমুক্ত খেত থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। বীজ রোপনের পূর্বে শোধন করে নিন। এব্যাপারে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অথবা খাকসারের সাথে আলোচনা করতে পারেন।

জমি সুনিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন।

আঁখা, চাষের সাথে সাথী ফসল হিসাবে আলু, পিয়াঁজ, রসুন, ধনে , ফেলন, মটর, খেসারী ইত্যাদী ডাল ফসল চাষ করতে পানে।

৪) ডাল জাতীয় ফসল চাষ:-

দক্ষিণ অঞ্চলের চাষী ভাইয়েরা যাঁরা আমন কাটার পর শুধু খেসারী চাষ করে থাকেন ।তাঁরা এ পক্ষকালে খেসারী কালাই আমন খেতে ছিটিয়ে বুনে দিন।

এ পক্ষকালে ছোলা ডাল চাষ করার উপযুক্ত সময়। আমন কেটে দোয়াশ মাটিতে ছোলার চাষ করুন। খেত পানি সুনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করুন। ছোলার জমিতে অন্যান্য সারের সাথে আপনি প্রতি বিঘায় ১ (এক)কেজি বরিক এসিড প্রয়োগ করুন। ভাল ফলন পাবেন। বিএডিসির বীজ বিক্রয় কেন্দ্র /বিএডিসির অনুমোদিত বীজ ডিলারের নিকট বীজ পাবেন।

এ পক্ষকালে ফেলন, মটর, চাষ করতে পারেন। তবে মুসুর চাষ করলে ফলন কম পাবেন।

৫) তেল জাতীয় ফসল চাষ:-

(ক) সরিষা চাষ:- এ পক্ষকালে সরিষা চাষ করবেন না।

বীজ বপনের ১৫-২০ দিনর মধ্যে একবার এবং ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে (ফুল আসার সময়) আর একবার আগাছা পরিস্কার করুন।

বীজ বপনের ২৫-৩০ দনির মধ্যে প্রথম এবং ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে (ফল ধরার সময়) দ্বিতীয় সেচ দিন।

যদি বপনের সময় বোরিক এসিড প্রয়োগ করে না থাকেন তা হলে প্রতিলিটার পানিতে ৫ গ্রাম বোরিক এসিড মিশিয়ে স্প্রে করলে ভাল ফল পাবেন। মনে রাখবেন প্রতিটি সারই সরাসরি গাছে প্রয়োগ করা বিপদ জনক। তাই কখনই

মাত্রাতিরিক্ত সার প্রয়োগ করবেন না।

(খ) তিসি চাষঃ- চাষী ভাই যে জমিতে সেচের সুবিধা নাই এমন জমিতে এপক্ষকালে তিসি চাষ করতে পারেন। তিসি খেত আগাছামুক্ত রাখুন। এটি একটি খড়া সহিষ্ণু ফসল। তবে প্রয়োজনমত সেচ দিলে ফলন ভাল হবে। তিসি কাটার পর পাট / আউশ চাষ করতে পারবেন।

(গ) চিনাাবাদাম চাষঃ-এ পক্ষকাল চিনাবাদাম চাষের উত্তম সময় । দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ মাটিতে চিনা বাদাম চাষ করুন। শেষ চাষে নির্ধারিত মাত্রায় জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করুন।

চাষী ভাই, **চিনাবাদাম চাষে অবশ্যই জিপসাম প্রয়োগ করবেন।**

ঢাকা-১ জাতের চিনাবাদাম চাষ করুন। বিএডিসির বীজ বিক্রয় কেন্দ্র /বিএডিসির অনুমোদিত বীজ ডিলারের নিকট বীজ পাবেন।

৬) বোরো চাষঃ- চাষী ভাই, এ পক্ষকাল বোরো বীজ তলা করার উত্তম সময়। জাতের জীবনকাল এবং মূল জমি প্রাপ্যতা বিবেচনা করে ধাপে ধাপে বীজ তলা করুন। যে সকল জাতের জীবনকাল বেশী সেসকল জাতের বীজতলা এপক্ষকালের মধ্যেই শেষ করুন।

সিলেট অঞ্চলে ফাল্গুনের প্রথম পক্ষকাল পর্যন্ত ঘন কুয়াশা থাকে । ফসলে ফাল্গুনের ২য় পক্ষকালে ফুল আসবে এমন হিসাব করে বীজতলা করুন। এঅঞ্চলে ১৫-৩০ কার্তিক ব্রিধান -২৯ জাতের বীজতা করার উত্তম সময়। ৭ অগ্রহায়ন থেকে ব্রিধান -২৮ এর বীজতলা করুন।

৭) গম চাষঃ- এপক্ষকাল গম বীজ বপনের উত্তম সময়। যশোর., চুয়াডাংগা , মেহেরপুর, ঝিনাইদহ এবং কুষ্টিয়া অঞ্চলের চাষী ভাইয়েরা এ পক্ষকালের মধ্যে গম বীজ বপন করলে ভাল ফলন পাবেন।

বপনের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে বপন পূর্ব সেচ দেয়ার পর মাটিতে জোঁ আসলে বীজ বপন করুন।

শেষ চাষে অবশ্যই নির্ধারিত মাত্রায় টিএসপি, এমওপি, জিপসাম এবং প্রতি বিঘায় এক কেজি বোরন সার/ বোরিক এসড প্রয়োগ করুন।

৮) আলু চাষঃ-চাষী ভাই, আলু চাষের জন্য সেচ এবং নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত দো-আঁশ এবং বেলে দো-আঁশ জমি নির্বাচন করুন। এ পক্ষকালের মধ্যে বীজ আলু রোপন শেষ করুন। ভাল ফলন পাবেন। এরপর চাষ করলে ভাল ফলন পাবেন না। ডায়মণ্ড, কার্ডিনাল এবং এ্যাস্ট্রোরিক্স জাতের আলূ চাষ করুন। সুস্থ , সবল , রোগমুক্ত আলুবীজ ব্যবহার করুন। প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান আর্থাৎ বিএডিসির বীজ আলূ ব্যবহার করুন। আপনি্ ভাল ফলন পাবেন।

রোপনের সময় নির্ধারিত মাত্রার সমস্ত গোবর /কম্পোস্ট সার, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংসালফেট এবং অর্ধেক ইউরিয়া সার মাটিতে মিশিয়ে দিন।

৯) চাষী ভাই এপক্ষকালে কলা, আনারস এবং পেপের চারা রোপন করুন।

১০) শীতকালীন সব্জি চাষঃ- চাষী ভাই, সব্জি চাষের জন্য রৌদ্রউজ্জল সেচ এবং সুনিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করুন। উঁচু , মাঝারি উঁচু, দোআঁশ এবং বেলে দোআঁশ মাটি নির্বাচন করুন।

ফুলকপির চারা মূল জমিতে রোপন করতে পারেন।

এ পক্ষকালেও নাবী জাতের বাঁধা কপির বীজ তলা তৈরী এবং ইতি পূর্বে করা চারা মূল জমিতে রোপন করুন।

এ পক্ষকালে লালশাক, পালংশাক, খেত লাউ, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, লেটুস, ইত্যাদি চাষ করুন।

পূর্বে চাষকৃত ফুল কপি এবং বাঁধা কপি খেতের আগাছা পরিস্কার করুন। মাটির আস্তরন ভেঙ্গে দিন। রোপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে ২য় কিস্তি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করুন। ফুলকপির ফুল আসা শুরু হলে পাতা দিয়ে ফুল্ ডেকে দিন।

টমেটো চারা রোপন করুন। বারি টমেটো -২,৬ জাতের টমেটো চাষ করুন।

বিএডিসির অনুমোদিত বীজ ডিলারের নিকট বীজ পাবেন। লাউয়ের মাচা তৈরী করে দিন।

১১) মসলা চাষঃ-

পিয়াঁজ চাষঃ- চাষী ভাই, আমদের দেশে পিয়াঁজের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। ছোট বড় সবাই পিয়াঁজ খেয়ে থাকেন। সরকার প্রতিবছর বিপুল অংকের বৈদেশীক মূদ্রা খরচ করে বিদেশ থেকে পিয়াঁজ আমদানী করে থাকে। রমজানে ব্যবসায়ীরা পিয়াঁজের দাম বাড়িয়ে দিয়ে ক্রেতাদের অনেক কষ্ট দিয়ে থাকে। পিয়াঁজ চাষ করুন। নিজে লাভবান হোন , দেশকে স্বাভলম্বী করুন।

পিয়াঁজের জন্য দোআঁশ এবং বেলে দোআঁশ মাটি নির্বাচন করুন।

উর্বর মাটি, সেচ ও নিষ্কাশনযুক্ত জমি নির্বাচন করুন।

এ পক্ষকালে আপনি বীজ তলা করতে পারেন। অথবা সরাসরি জমিতে বীজ বুনে দিতে পারেন।

এপাক্ষকালেও আপনি কন্দ রোপন করতে পারেন। যে সকল খেতে ইতোমধ্যে কন্দ রোপন করেছেন, সেসকল খেত আগাছামুক্ত রাখুন। ৮-১০ দিন পর পর সেচ দিন।

রসুন চাষঃ-চাষী ভাই এপক্ষকালে রসুন চাষ করুন।

১২। তরমুজের বীজ সংগ্রহ করুন।

বীজ , সার, সেচ, যত্ন , এই চারে রত্ন। চাষী ভাই আপনার ফসলের যত্ন নিন । অধিক লাভবান হোন।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী জিরায়া'ত
আ:মু:জা: বাংলাদেশ।
মোবাইল:-০১৯১৩ ৫২০ ৬৭২

দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে

সংকলন ও উপস্থাপনা : **এম. আহমদ**

হজ্জযাত্রীদের সুস্বাস্থ্যে করণীয় ॥

হজ্জযাত্রীদের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রস্তুতির পাশাপাশি স্বাস্থ্যগত বিষয়েও কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন। হজ্জে প্রায় ২৫-৩০ লাখ লোকের সমাগম হয়, এ থেকে মস্তিষ্কের জটিল ও প্রাণঘাতী অসুখ মেনিনজাইটিস হতে পারে। তাই দেশে থেকেই মেনিনগোকক্কালের টিকা সবার অবশ্যই নিয়ে নেয়া উচিত। টিকা নেয়ায় অবহেলা স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটাতে পারে। সৌদি আরব তথা মক্কানগরী, আরাফাত ময়দানের তাপমাত্রা আমাদের চেয়ে বেশি পক্ষান্তরে মদীনা তুলনামূলক ঠান্ডা, এই ধরনের ভিন্ন আবহাওয়া, ভিন্ন খাদ্যাভ্যাস, হঠাৎ বেশি পরিশ্রম ও বিপুল জনসমাগমের জন্য কিছু অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। এজন্য আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং তিনি আপনাকে বলে দেবেন কোন অসুখের জন্য কি ওষুধ, কিভাবে খেতে হবে। এ লক্ষ্যে আলাদা আলাদা প্যাকেটের গায়ে ওষুধের নাম, কোন অসুস্থতায় কী ডোজে খাবেন তা লিখে রাখবেন। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সঙ্গে রাখা ভাল। এতে আপনার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন, আপনার নেয়া ওষুধগুলো ও এর পরিমাণ যেন আপনার রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনে ওষুধের জেনেরিক নামসহ উল্লেখ থাকে। আপনার হ্যান্ডব্যাগে অবশ্যই এ প্রেসক্রিপশন রাখবেন নতুবা সৌদি আরব এয়ারপোর্টে চেকইনে সমস্যা হতে পারে। সাধারণত যে ওষুধগুলো সঙ্গে নিতে হয় তা হলো–

* যেহেতু হজ্জে প্রচুর হাঁটতে হয়, তাই যাদের হাঁটার তেমন অভ্যাস নেই তারা ব্যথানাশক ওষুধ এসিক্লোফেনাক, ডাইক্লোফেনাক বা প্যারাসিটামল সঙ্গে নিতে পারেন।

* হজ্জে খাবার বলতে মূলত রুটি, দুধ, দুধ দিয়ে তৈরী বিভিন্ন খাবার। এ ছাড়া সৌদি সরকার বিনামূল্যে সবাইকে এক ধরনের ঘোল লাবাং খেতে দেন। অনেকের মিল্ক ইনটলারেন্স থাকে, এর ফলে পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা, ডায়রিয়া হতে পারে। ডায়রিয়ার জন্য ওরাল স্যালাইন ও মেট্রোনিডাজল ট্যাবলেট সঙ্গে নেবেন। পেট ব্যথার জন্য হায়োসিন বুটাইল ব্রমাইড রাখবেন। বমি বা বমি বমি ভাবের জন্য ডমপেরিডন খাওয়ার ৩০ মিনিট আগে খাবেন। মাথাঘোরা, মাথাব্যথার জন্য ষ্টিমেটিল নেবেন। এছাড়া সেখানকার গরম ঠান্ডা আবহাওয়ার জন্য নাক দিয়ে পানি ঝরা, হাঁচি হতে পারে। ডাক্তারের পরামর্শে এন্টিহিস্টামিন নেবেন। গা-ব্যথা ও বিভিন্ন ধরনের জ্বর আসাও অস্বাভাবিক নয়। প্যারাসিটামল অবশ্যই নেবেন। মনে রাখবেন, লাখ লাখ হাজীর স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জন্য সৌদি সরকার ডাক্তারের মাধ্যমে বিনামূল্যে যে স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করেন, তাতে লম্বা লাইন করে প্রেসক্রিপশন নিতে হয় এবং মার্কেট বা ক্লিনিক থেকে ওষুধ কিনে নিতে হয়। তাই দেশে থেকেই এর পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়ে নেবেন, যাতে হজ্জে গিয়ে কোন বিড়ম্বনায় পরতে না হয়।

* বিশ্বব্যাপী এখনো সোয়াইন ফ্লুর প্রকোপ কমেনি। যদিও আগের তুলনায় এখন এ পরিস্থিতি অনেকটা ভালো। তাই যাদের হাঁচি,কাশি আছে, তাদের থেকে দূরে থাকাই উত্তম।

* আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা থেকেও অনেকে হজ্জে আসেন। তাদের কিছু ভাইরাল ইনফেকশন থাকতে পারে যা ড্রপলেট অর্থাৎ হাঁচি-কাশি, কফ-থুথুর মাধ্যমে অন্যজনের ছড়াতে পারে। তাই তাদের থেকেও সাবধানে থাকবেন।

* পার্সোনাল হাইজিন অর্থাৎ ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আপনাকে অনেক সংক্রামক অসুখ থেকে দূরে রাখবে। (যুগান্তর, ০৭ নভেম্বর ০৯)

যশোরে সাঈদীর বিরুদ্ধে সমন জারি ॥

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে সুরা সদস্য দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে সমন জারি করেছেন যশোরের জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন। ২০০২ সালে কেশবপুর প্রেসক্লাবের তৎকালীন আহ্বায়ক আবু বক্কর সিদ্দিকীর দায়ের করা একটি মানহানি মামলায় আদালত বৃহস্পতিবার এ আদেশ জারি করে। আদেশে আগামী ৭ ডিসেম্বর সাঈদীকে সশরীরে আদালতে হাজির থাকার জন্য বলা হয়েছে। ২০০২ সালের ২৩ মার্চ লালমনিরহাটের এক তাফসীর মাহফিলে সাঈদী সাংবাদিকদের কটাক্ষ করে নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য দেন। (জনকণ্ঠ, ৬ নভেম্বর ২০০৯)

স্ত্রী হত্যার দায়ে ফাঁসির আদেশ ॥

মাত্র ৮ হাজার টাকা যৌতুকের কারণে স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার দায়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে নিলফামারী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের বিচারক এম, এ, নূর স্বামীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ডের রায় প্রদান করেছেন। (জনকণ্ঠ, ৬ নভেম্বর ০৯)

মহাজোট সরকার ইসলামবিরোধী কোন কাজ করবে না ॥

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, এনসিটিবি বিল্ডিংয়ে আগুন লাগানো ছিল নাশকতামূলক। যারা বর্তমান সরকারের জনকল্যাণ কর্ম ও নীতি বাধাগ্রস্ত করতে চায় তারাই এ নাশকতামূলক কাজ করেছে। তিনি বলেন, মহাজোট সরকার ইসলাম বিরোধী কোন কাজ করবে না।

(ইনকিলাব, ৬ নভেম্বর ২০০৯)

বগুড়ায় এক পরিবারের ৬ জনের যাবজ্জীবন ॥

বগুড়ার আদমদিঘী উপজেলার পলাশী গ্রামে যৌতুক না পেয়ে মারধর ও গায়ে আগুন দিয়ে শম্পা খাতুন নামে এক গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টা মামলায় স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়িসহ একই পরিবারের ৬ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে তাদের আরো ৬ মাস করে কারাদন্ডাদেশ দেয়া হয়। আদালত সূত্র জানায়, আদমদিঘী উপজেলার পলাশী গ্রামের শাহাদত আলীর মেয়ে শম্পা খাতুনকে প্রতিবেশী ইব্রাহীমের ছেলে আমুল বিয়ে করে। বিয়ের পর থেকে আসামিরা ৫০ হাজার টাকা যৌতুকের জন্য শম্পার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এতে রাজি না হওয়ায় শম্পাকে মারধর ও নির্যাতন করা হতো। ২০০৬ সালের ১৫জুন রাত ৮টার দিকে যৌতুক চাওয়া নিয়ে বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে স্বামী আমুল ও অন্যরা শম্পাকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। জ্ঞান হারিয়ে ফেললে শম্পাকে মৃত ভেবে ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। প্রায় ১৫ মিনিট পর জ্ঞান ফিরে এলে শম্পা আর্তনাদ করতে থাকে। তখন আসামিরা তার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে তার শরীরের অধিকাংশ পুড়ে যায়। প্রতিবেশীরা টের পেয়ে শম্পাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। (যুগান্তর, ০৫ নভেম্বর ২০০৯)